মহাশূন্যের কথা

মহাশূন্যের কথা

মনোজ দত্ত

(কেন্দ্রীয় সরকার পুরস্কৃত)

একমাত্র পরিবেশক
ভারত পাবলিশার্স
১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক

প্রবোধকুমার ভৌমিক., এম. এস. সি, পি. এইচ-ডি., ডি. এস-সি.
সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ

১৮বি/১সি টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মূল্য-১৬ টাকা মাত্র

মুদ্রক:
১৪/১ কলেজ রো, এম. এম. প্রেস

বর্তমান সংস্করণের প্রাক্-কথা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাধনা সম্ভব কিনা—আজ আর এ-বিতর্কে অবকাশ নেই। ভাষা ইতিমধ্যে নিজের শক্তি যেমন খুঁজে পেয়েছে, বিজ্ঞানের অধ্যাপক, গবেষক, ছাত্র এবং সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গীও তেমনি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে।

আমি বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ নই। 'মহাশূন্যের কথা', বলা বাহুল্য, কোন গবেষণাধর্মী নিবন্ধের গৌরব দাবী করে না। সৌরজগতের বহুবিদিত তথ্যগুলি আটপৌরে ভাষায় একেবারে সাধারণ পাঠকদের, বিশেষ করে সদ্য-স্বাক্ষরদের কাছে পৌঁছে দেবার বাসনা থেকে এ-বইয়ের পরিকল্পনা।

১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে 'মহাশূন্যের রহস্য' নামে বইটির প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের থেকে আশাতীত সাড়া পাই।

১৯৬৪ সালে বইটি 'মহাশূন্যের কথা' নামে নতুন আকারে প্রকাশের পর রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করে।

চাঁদে মানুষের অবতরণসহ মহাশূন্যের যথাসম্ভব সর্বাধুনিক তথ্য সংযোজনার চেষ্টা করেছি। তথ্যের গুরুভারে ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে সবসময়ে সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। আবার ভাষার অহেতুক রমণীয়তার লোভে বিজ্ঞান-মনস্কতা বিসর্জন দিইনি। এগুলি শুধুই আমার বিশ্বাসের কথা। এ বইয়ের ভালো-মন্দ বিচারের ভার পাঠক সাধারণের।

৭ টেমার লেন
কলিকাতা ৯

মনোজ দত্ত

সত্যেন বোস
জাতীয় অধ্যাপক

২২ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৬

ছেলেদের জন্য "মহাশূন্যের কথা" লিখেছেন শ্রীমান সরোজ দত্ত। ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগের প্রতিযোগিতায় বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক পুস্তক রচনার জন্য এটি প্রাইজ পেয়েছে।

সহজ ভাষায় গ্রহ নক্ষত্রের অনেক কাহিনী কথা তিনি বলেছেন। তা'ছাড়া মানুষ আজকাল যেসব কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে ওড়াচ্ছে তারও খবর সরোজবাবু দিয়েছেন। ছবি দিয়ে বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করবার চেষ্টাও করেছেন লেখক।

ছেলেমেয়েরা বইখানি এক নিশ্বাসে পড়ে, আনন্দ পাবে। বাংলা দেশে বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

২৪শে সেপ্টেম্বর '৬৫

সত্যেন বোস

গ্রহের গল্প

আজ একটা গল্প বলবো। এই গল্প সেই অচিন দেশের রাজপুত্র আর তার পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা অথবা সাগরতলের রাজকন্যা ও তার সোনার কাঠি রুপোর কাঠির গল্প নয়। এমন কি ভূতের গল্প অথবা সাতভাই চম্পা আর তাদের এক বোন পারুলের কাহিনীও এ নয়। এ হ'লো—ন'টি গ্রহ আর তাদের ছাব্বিশটি উপগ্রহের কথা।

সেই কোন্ ছোট বেলায় আমরা পড়ে এসেছি—'একে চন্দ্র', 'দুয়ে পক্ষ', তিনে নেত্র······'নয়ে নবগ্রহ'। আজ সেই নবগ্রহের কথাই বলছি।

আমাদের এই পৃথিবী সেই নব গ্রহের একটি গ্রহ। বাকী আটটি গ্রহের নামও অনেকের জানা। তবুও বলি—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো। ন'টি গ্রহ যেন ন'টি ভাই-বোন। আর উপ-গ্রহগুলো যেন ওদের ছেলেমেয়ে।

পৃথিবী ছাড়া আর যে আটটি গ্রহের নাম বললাম, তাদের একটি ~~তো নিশ্চয় তোমরা চেনো~~। সেই-যে সন্ধ্যাবেলার পশ্চিম আকাশের 'সন্ধ্যাতারা' বা 'সাঁঝের তারা'।

'গ্রহের গল্প'-এর অনেকাংশ আকাশবাণীর (All India Radio) কলিকাতা কেন্দ্রের 'বিদ্যার্থীদের জন্য' বিভাগে ~~লেখক কর্তৃক পঠিত হয়।~~

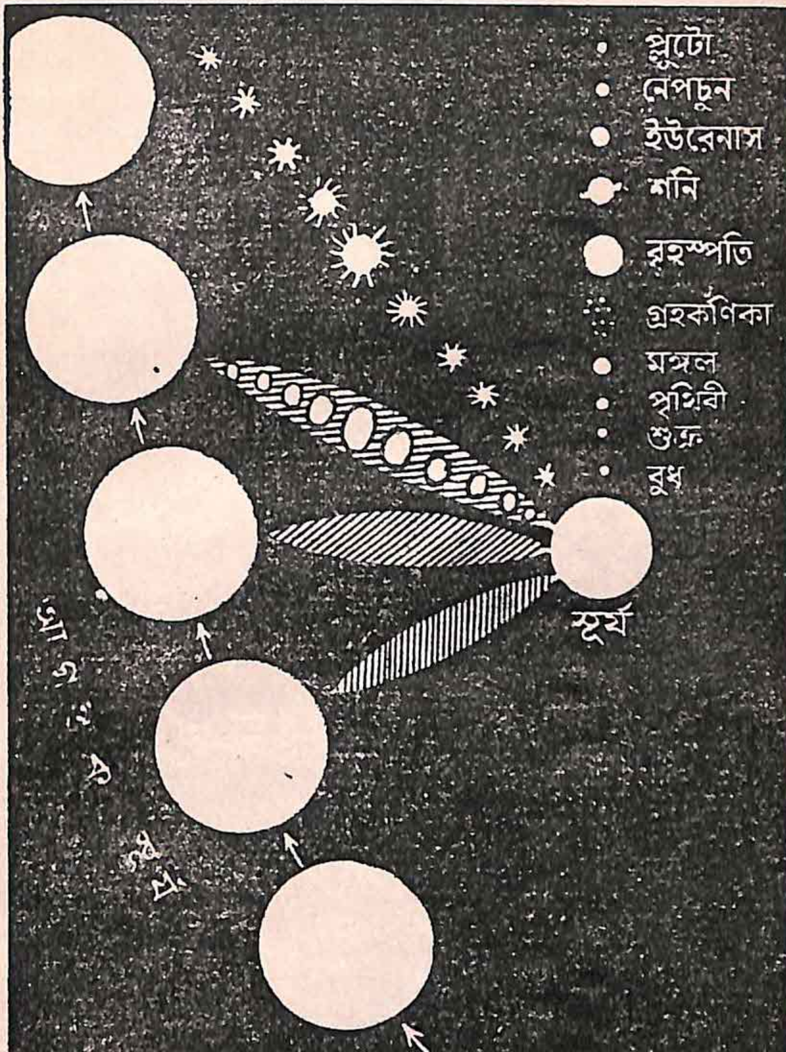
শুনে হয়তো অবাক লাগবে—পশ্চিম আকাশের ওই সন্ধ্যাতারাই ভোর রাতে পুব আকাশের 'শুকতারা' বা 'প্রভাতী তারা'! আরো মজার কথা হলো কি—হাজার হাজার বছর ধ'রে আমরা যাকে শুকতারা বা সন্ধ্যাতারা ব'লে আসছি, আসলে কিন্তু সেটি মোটেই 'তারা' নয়—একটি গ্রহ। ভারতীয় ঋষি শুক্রাচার্যের নাম অনুসারে ওর নাম রাখা হয়েছে শুক্র-গ্রহ।

রাতের আকাশে শুক্র-গ্রহকে একটি তারার মত দেখায়। আমরা যদি শুক্রগ্রহে গিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকাতে পারতাম, তাহলে দেখতাম—আমাদের পৃথিবীও একটি তারার মত জ্বলছে। কী অদ্ভুত ব্যাপার!

গ্রহ উপগ্রহের জন্ম

সে অনেক দিন আগের কথা। কতদিন আগের! তার হিসেব ক'রে কূল-কিনারা পাবো না। তবে বিজ্ঞানী জিন্‌স-এর মতে আজ থেকে চারশ' কোটি বছর আগের ঘটনা। যাই হোক-না-কেন, সে-সময় সৌর জগতে সূর্য ছিল একাকী, নিঃসঙ্গ। কিন্তু একদিন হলো কি, আমাদের সূর্য থেকে বড় আর একটি সূর্য আর এক জগৎ থেকে এসে এই সূর্যের জগতে ঢুকে পড়লো আর ভীষণ বেগে সূর্যের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। শুধু কি তাই। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, যেন তেমনি, ওই আগন্তুক সূর্য আমাদের সূর্যকে আকর্ষণ করতে লাগলো। কিন্তু আমাদের সূর্যই-বা ছেড়ে দেবে কেন? সেও আপন শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে ওই আগন্তুক সূর্যকে নিজের দিকে টানতে লাগলো। কিন্তু দেহের আয়তনের তুলনায় আমাদের সূর্য ছিল অনেক ছোট, আর ওই আগন্তুক সূর্য অনেক বড়। তাই তার আকর্ষণের ক্ষমতাও ছিল অনেক বেশী। ফলে হলো কি—আমাদের সূর্যের দেহের কিছু অংশ ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই আগন্তুক সূর্যটি তার চলার পথের মুখ ঘুরিয়ে বিপুল বেগে অন্যপথে পালিয়ে গেল।

সূর্য-দেহের সেই ছিন্ন অংশটুকু দেখতে অনেকটা পটলের মত। এই পটলের স্থানে স্থানে জমাট বেঁধে গ্রহগুলোর উৎপত্তি হলো।



বৈজ্ঞানিক স্যার জেমস্ জিন্স্-এর মতে যে-ভাবে গ্রহদের জন্ম হয়।

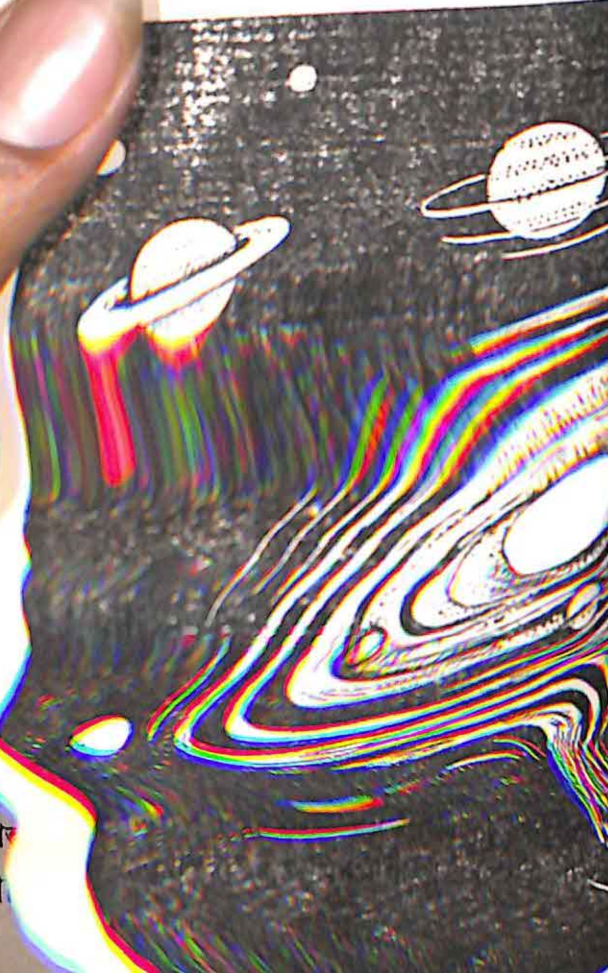
আবার এও হতে পারে, পটলের মত ছিন্ন অংশটুকুই আরো ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে তৈরী হলো—ন'টি গ্রহ, ছাব্বিশটি উপগ্রহ, আর কোটি কোটি

শুনে হয়তো অবাক লাগবে—পশ্চিম
সন্ধ্যাতারাই ভোর রাতে পুব
তারা'। আরো মজার কথ
ধ'রে আমরা যাকে শুকতারা ব
কিন্তু সেটি মোটেই 'তারা'
শুক্রাচার্যের নাম অনুসারে

রাতের আকাশে শুক্র
যদি শুক্রগ্রহে গিয়ে
দেখতাম
ব্যা

মহ

গ্রহ-কণিকা। এই হলো গ্র
বিজ্ঞানী স্যার জেমস জিন্স-এর
মতবাদ (tidal theory) বলে
এটাই এতদিন সবচেয়ে নি
কয়েক বছর আগে আর এক ম
করেছে। তাহলো বিজ্ঞানী লাপ্লা
সুয়েস, হয়েল প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞা



াগ
পা

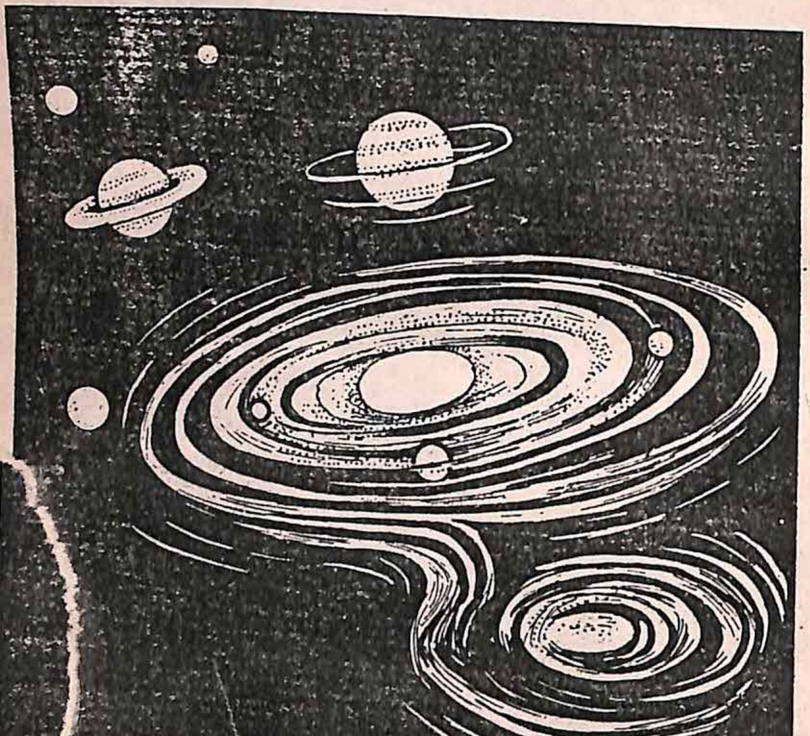
লক্ষ বছর তাপ বিলিয়ে এই নীহারিকা ক্রমশ ঠাণ্ডা …টি হতে লাগলো। আয়তনে ছোট হওয়ার জন্য আরো …জোরে ঘুরতে লাগলো। আবার এই বনবন্ ক'রে ঘোরার …মশ চ্যাপ্‌টাও হতে লাগলো। তারপর এই চ্যাপটার … এতই বাড়তে লাগলো যে, নীহারিকার দেহের খানিকটা …গাড়ীর চাকার মত আকারে খসে পড়লো। একটু অংশ শুধু …র খসলো না। অনেক বার অনেক অংশ খসে পড়লো। আর …খসে-পড়া অংশগুলিই আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধলো। এরাই প্লুটো—নেপচুন—ইউরেনাস—শনি—বৃহস্পতি। এরাই …একটি গ্রহ-কণিকা। এরাই মঙ্গল—পৃথিবী—শুক্র—বুধ। আর …হারিকার দেহের যে অংশটুকু বাকী রইলো সেটাই আমাদের সূর্য।

এই হল গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি সম্পর্কে বলয় মতবাদ (disc …eory) বা নীহারিকা (nebular) মতবাদ। জানি না আগামী …নে এই মতবাদ আবার বাতিল হবে কিনা।

জন্মের পর গ্রহগুলো ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে লাগলো এবং সূর্যের টানে সূর্যেরই চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকলো। সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে এদের পাক খাওয়ার ধরন এমন-ই যে, কেউ কারো সঙ্গে ধাক্কা খায় না। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক পথ, পৃথক পৃথক গতি। সূর্য থেকে যে যত কাছে থেকে ঘুরছে, তার গতি তত বেশী। তেমনি যে যত দূরে থেকে ঘুরছে, তার গতি তত কম। কাজেই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে কাছের গ্রহের কম সময়, আর দূরের গ্রহের বেশী সময় লাগে। গ্রহ ন'টির মধ্যে সূর্যের সবচেয়ে কাছে আছে বুধ, তারপর শুক্র, তারপর পৃথিবী। পৃথিবীর পরে একে একে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং সবশেষে প্লুটো। মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহ …'টির মাঝখানে আছে খুব ছোট ছোট অনেক গ্রহ। এদের সমবেত …—গ্রহ-কণিকা অথবা গ্রহাণুপুঞ্জ। সংখ্যায় এরা হাজারে হাজারে … লক্ষে। গ্রহ-কণিকারাও নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট গতিতে সূর্যের …াশে চক্কর দিচ্ছে।

গ্রহ-কণিকা। এই হলো গ্রহ-উপগ্রহগুলির জন্ম-ইতিহাস সম্পর্কে বিজ্ঞানী স্যার জেমস্ জিন্স্-এর মতবাদ। এই মতবাদই জোয়ার মতবাদ (tidal theory) বলে পরিচিত।

এটাই এতদিন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হতো। কিন্তু কয়েক বছর আগে আর এক মতবাদ অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে। তাহলো বিজ্ঞানী ল্যাপ্লাস-এর 'বলয় মতবাদ'। ইউরে, স্যুয়েস্, হয়েল প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীগণ বলয় মতবাদের সমর্থক।



নীহারিকার দেহ থেকে যে-ভাবে গ্রহ, উপগ্রহ ও সূর্যের জন্ম হয়।

বলয় মতবাদঃ সৃষ্টির প্রথম-অবস্থায় সৌরজগতের বিরাট জায়গায় একটি নীহারিকা ছিল। জ্বলন্ত বাষ্পে-ভরা এই নীহারিকা সারা দিন-রাত শুধু ঘূর্ণি ঝড়ের মত পাক খেতো।

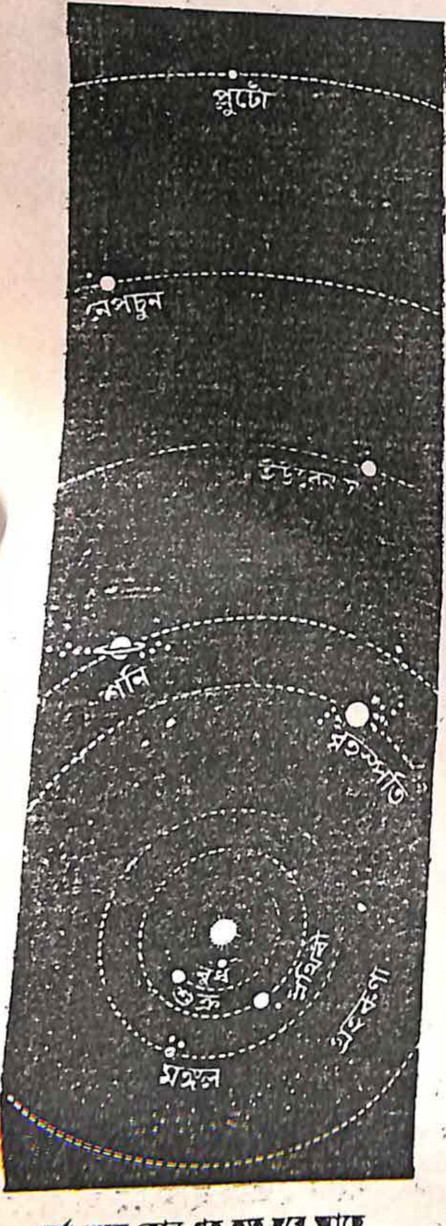
লক্ষ লক্ষ বছর তাপ বিলিয়ে এই নীহারিকা ক্রমশ ঠাণ্ডা আর ছোট হতে লাগলো। আয়তনে ছোট হওয়ার জন্য আরো বেশী জোরে ঘুরতে লাগলো। আবার এই বনবন ক'রে ঘোরার জন্য ক্রমশ চ্যাপ্‌টাও হতে লাগলো। তারপর এই চ্যাপটার পরিমাণ এতই বাড়তে লাগলো যে, নীহারিকার দেহের খানিকটা অংশ গাড়ীর চাকার মতো আকারে খসে পড়লো। একটু অংশ শুধু একবার খসলো না। অনেক বার অনেক অংশ খসে পড়লো। আর এই খসে-পড়া অংশগুলিই আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধলো।

এরাই প্লুটো—নেপচুন—ইউরেনাস—শনি—বৃহস্পতি। এরাই এক একটি গ্রহ-কণিকা। এরাই মঙ্গল—পৃথিবী—শুক্র—বুধ। আর নীহারিকার দেহের যে অংশটুকু বাকী রইলো সেটাই আমাদের সূর্য।

এই হল গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি সম্পর্কে বলয় মতবাদ (disc theory) বা নীহারিকা (nebular) মতবাদ। জানি না আগামী দিনে এই মতবাদ আবার বাতিল হবে কিনা।

জন্মের পর গ্রহগুলো ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে লাগলো এবং সূর্যের টানে সূর্যেরই চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকলো। সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে এদের পাক খাওয়ার ধরন এমন-ই যে, কেউ কারো সঙ্গে ধাক্কা খায় না। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক পথ, পৃথক পৃথক গতি। সূর্য থেকে যে যত কাছে থেকে ঘুরছে, তার গতি তত বেশী। তেমনি যে যত দূরে থেকে ঘুরছে, তার গতি তত কম। কাজেই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে কাছের গ্রহের কম সময়, আর দূরের গ্রহের বেশী সময় লাগে। গ্রহ ন'টির মধ্যে সূর্যের সবচেয়ে কাছে আছে বুধ, তারপর শুক্র, তারপর পৃথিবী। পৃথিবীর পরে একে একে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং সবশেষে প্লুটো। মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহ দু'টির মাঝখানে আছে খুব ছোট ছোট অনেক গ্রহ। এদের সমবেত নাম—গ্রহ-কণিকা অথবা গ্রহাণুপুঞ্জ। সংখ্যায় এরা হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে। গ্রহ-কণিকারাও নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট গতিতে সূর্যের চারপাশে চক্কর দিচ্ছে।

এবারে কোন্ গ্রহ সূর্য থেকে কত দূরে আছে, তার একটা তুলনামূলক হিসেব করা যাক। আমাদের মাপের সুবিধার জন্য এমন একটি কল্পনার মাপ-কাঠি নিই, যার দৈর্ঘ্য 93 লক্ষ মাইল। এখন, এই মাপ-কাঠিতে সূর্য থেকে বুধের দূরত্ব প্রায় 4 কাঠি, শুক্রের 7 কাঠি, পৃথিবীর 10 কাঠি এবং মঙ্গলের 15 কাঠি। গ্রহ-কণিকাদের 26 কাঠি, বৃহস্পতির 52, শনির 95, ইউরেনাসের 191, নেপচুনের 300 এবং সর্বশেষ গ্রহ প্লুটোর দূরত্ব প্রায় 400 কাঠি।



সূর্য থেকে কোন্ গ্রহ কত দূরে আছে

গ্রহগুলোর মধ্যে আয়তনে বুধ সবচেয়ে ছোট এবং বৃহস্পতি সবচেয়ে বড়। বুধের তুলনায় পৃথিবী কত বড় ?

অন্তত কুড়িটি বুধ এক জায়গায় জোড়া লেগে একটা পৃথিবীর আয়তনের সমান হতে পারে। তেমনি তেইশ হাজার চারশ'টি বুধ অথবা তেরশ'টি পৃথিবী একসঙ্গে জোড়া লেগে একটি বৃহস্পতির আয়তনের সমান। আয়তনে শুক্র এবং পৃথিবী

প্রায় সমান সমান। কিন্তু মঙ্গল পৃথিবী থেকে ছোট। সাতটি মঙ্গল গ্রহ মিলে-মিশে একটি পৃথিবীর সমান। শনি পৃথিবী থেকে বেশ বড়। একটি শনির সমান প্রায় সাড়ে সাতশো পৃথিবী। ইউরেনাস এবং নেপচুনও পৃথিবী থেকে বড়। ইউরেনাসের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় তেষট্টি গুণ এবং নেপচুন প্রায় আটাত্তর গুণ। প্লুটো কিন্তু পৃথিবী থেকে অনেক ছোট। দশটি প্লুটোর আয়তনের সমান একটি পৃথিবীর আয়তন।

এবারে প্রত্যেক গ্রহ সম্পর্কে একটু পৃথক পৃথক আলোচনা করা যাক। প্রথমেই বলি সূর্যের সব থেকে কাছের গ্রহ বুধের কথা।

বুধ-গ্রহ

সব চেয়ে ছোট গ্রহ বুধ। বুধের ব্যাস মাত্র পাঁচ হাজার কিলোমিটার। আর আয়তনে পৃথিবীর বিশ ভাগের এক ভাগ।

পৃথিবীর প্রাচীন মানুষ অনেক আগে থেকেই বুধ গ্রহের কথা জানতো। কিন্তু তখনকার দিনের মানুষের কাছে এক একটি গ্রহ ছিলো এক একটি দেবতা বা দেবতাদের দূত। বুধ-গ্রহ হলো—রোমানদের দেবদূত মার্কারি (Mercury) রোমানদের বর্ণনায় এই মার্কারির গায়ে দুটি ডানা ছিল।

ভারতবর্ষ, আরব এবং গ্রীসের মানুষও বুধ গ্রহকে প্রাচীনকাল থেকেই চিনতো। গ্রীক কবি বুধকে বলতো 'সূর্য-দূত'।

বুধ সূর্যের সব চেয়ে কাছে আছে বলে সে সূর্যের তাপ পায় সবচেয়ে বেশী। তাই বুধ-গ্রহে এত গরম যে, সাগরের জল পর্যন্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটতে পারে। আমাদের এই বাংলা দেশের গ্রীষ্মকালে একশো সাত আট ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপে আমরা হিম্‌সিম্ খাই। কিন্তু বুধে তাপমাত্রা অনেক বেশী। প্রায় 752 ডিগ্রী ফারেনহাইট। এত তাপে কোন জীবই বেঁচে থাকতে পারে না। তাই বুধ গ্রহে জীবের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

বুধ-গ্রহের আধখানা অংশে সব সময় দিন আর বাকী আধখানা

অংশে সব সময়েই রাত। তার মানে, যে অংশে দিন সে-অংশ সব সময়েই সূর্যের দিকে মুখ ক'রে থাকে, আর যে-অংশে রাত সে-অংশ সবসময়েই সূর্যের দিকে পেছন ফিরে থাকে। দিন-অংশ আলোয় আলোময় আর প্রখর কিরণে তপ্ত। কিন্তু রাত-অংশ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন আর হিম-শীতল ঠাণ্ডায় জমাট।

সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে 365 দিন। সেজন্য 365 দিনে পৃথিবীর এক বছর। এই রকম 88 দিনে বুধ সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসে। সেজন্য বুধের বছর পৃথিবীর 88 দিনে। পৃথিবীর তুলনায় বুধের এই ক্ষিপ্রগতির জন্যেই তো ওর নাম মার্কারি। তাইতো রোমানরা ওকে বলতো—স্বর্গলোকের দৌড়িয়ে। পৃথিবীতে কারো বয়স যদি 10 বছর হয়, তবে বুধ গ্রহে তার বয়স হবে 40 বছরেরও বেশী। কি মজার কথা!

বুধ-এর ব্যাস মাত্র 3387 কিলোমিটার (2100 মাইল) এবং ওজন পৃথিবীর ওজনের $\frac{1}{24}$ ভাগের সমান।

বুধ গ্রহে জল নেই, বাতাস নেই, বৃষ্টিও নেই। বুধ শুধু চাঁদ উপগ্রহের মত প্রাণহীন শুষ্ক গ্রহ।

শুক্র-গ্রহ

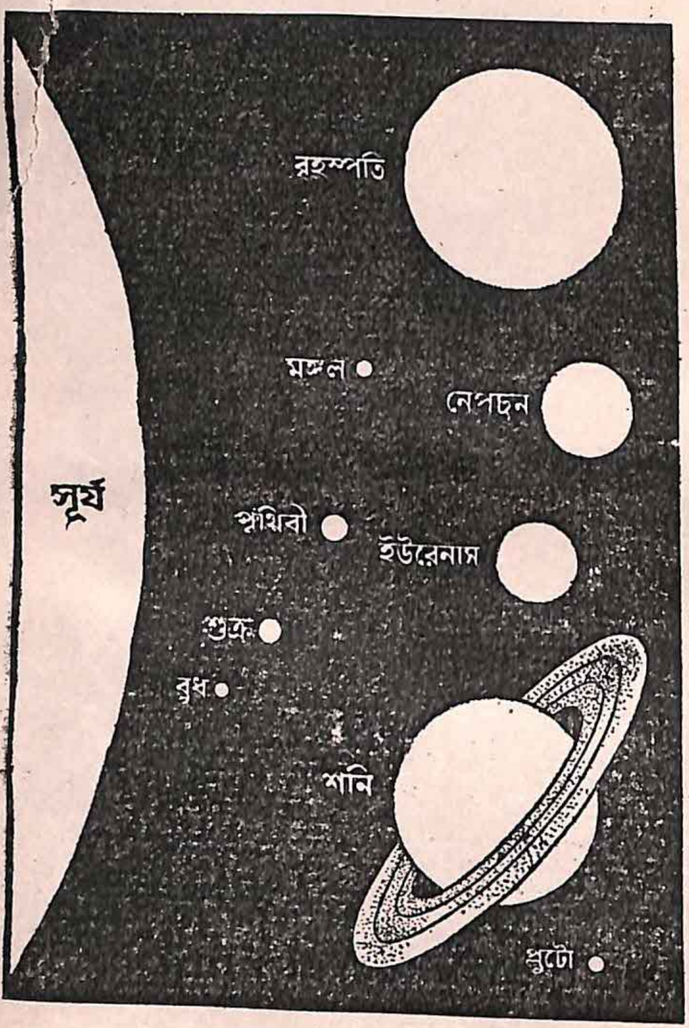
প্রাচীনকালে আমাদের দেশের জ্যোতিষীরা শুক্র-গ্রহের অনেক কথা জানতেন। হিন্দু-পুরাণে শুক্র-গ্রহ সম্পর্কে অনেক কিছু লেখাও আছে। লেখা আছে, আচার্য শুক্র ছিলেন দৈত্যদের পরম গুরু। আবার কেউ কেউ শুক্রকে 'কাণা শুক্র' ব'লেও অনেক কাহিনী রচনা ক'রে গেছেন। অবশ্য 'কাণা শুক্র' বলার একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে—বুধ গ্রহের মত শুক্র-গ্রহের অর্ধেক অংশ চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেখানে কোনদিনই সূর্যের আলো পৌঁছায় না, তাই সেখানে চির রাত্রি। বাকী অর্ধেক চির-দিন। হয়তো এজন্যই বলা হয়, শুক্র এক চোখে দেখতে পায়, আর এক চোখে দেখতে পায় না।

শুক্র-গ্রহ আমাদের কাছে শুকতারা। আবার এই শুকতারাই সন্ধ্যার আকাশে সন্ধ্যাতারা আর প্রভাতকালে প্রভাতী-তারা। কত সুন্দর, কত উজ্জ্বল দেখতে এই শুকতারা! এজন্যই তো শুক্র-গ্রহ হলো রোমানদের কাছে ভেনাস— সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। উজ্জ্বলতায় শুক্র বা ভেনাস হলো গ্রহদের ভিতর অদ্বিতীয়। কিন্তু এত উজ্জ্বলতা এর কোথা থেকে এল?

বিজ্ঞানীরা বলেন—পৃথিবীর মত শুক্রের আকাশে আবহমণ্ডল আছে। আর সেই আবহমণ্ডলের ওপর মেঘ ও ধূলিকণা ভেসে বেড়ায়। এদের গায়ে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়। তাই শুক্রকে এত উজ্জ্বল দেখায়। অবশ্য, বিজ্ঞানী-মহলে এই নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। তবে শুক্র-গ্রহে যে আবহমণ্ডল আছে, সে কথা কেউ আজ অস্বীকার করেন না। শুক্র-গ্রহের আবহমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস আছে— এটা প্রমাণিত হয়েছে।

শুক্র-গ্রহের আবহমণ্ডলে অক্সিজেন আছে কিনা—আজ পর্যন্ত নিশ্চিত ভাবে জানা যায়নি। জল আছে কিনা তাও বলতে পারেননি বৈজ্ঞানিকেরা। কাজেই শুক্র-গ্রহে জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড সেখানে হয়তো আছে। তাই উদ্ভিদের অস্তিত্ব হয়তো সেখানে অস্বীকার করা যায় না এবং সেক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ অক্সিজেনও নিশ্চয়ই আছে। কেননা, পৃথিবীর উদ্ভিদ তো কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে। কাজেই পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয়, শুক্র-গ্রহে জীবনের আবির্ভাব ঘটতে শুরু হয়েছে—অন্তত সোভিয়েট বিজ্ঞানী বারবাশোভ একথা মনে করেন। সম্প্রতি মার্কিন বিজ্ঞানী স্ট্রং তাঁর পরীক্ষায় শুক্র-গ্রহে জলীয় বাষ্পের সন্ধান পেয়েছেন। কাজেই সেখানে জীব থাকা একেবারে অসম্ভব—একথা জোর দিয়ে বলা যায় না যেমন বলা যায় না জীব আছেই। আসলে শুক্র-গ্রহ এখনও গভীর রহস্যে ভরা।

পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে—পৃথিবীর বছর থেকে শুক্রের বছর অনেক ছোট। মাত্র 225 পৃথিবী-দিনে সেখানে এক বছর। কিন্তু



সূর্যের আয়তনের তুলনায় গ্রহগুলোর আয়তন
[চিত্রে সূর্যের শুধু একটু অংশ দেখানো হয়েছে]

শুক্র-দিন হলো পৃথিবীর দিন থেকে অনেক বড়। কুড়ি থেকে চব্বিশটি পৃথিবী-দিনের সমান একটি শুক্র-দিন।

এত বড় দিন ভোগ করবার জন্য একটিও মানুষ নেই সেখানে। আছে শুধু বাতাস-মেঘ-ঝড় ঝঞ্ঝা। আর আছে আলো-অন্ধকারের আনাগোনা।

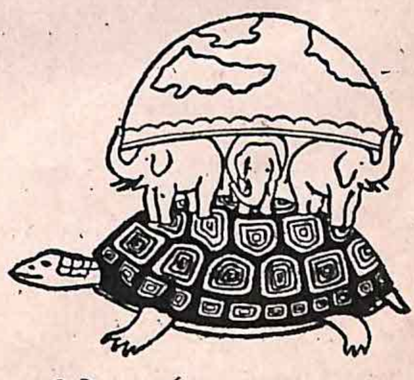
পৃথিবী গ্রহ

পৃথিবীর আকার ঃ ছেলেবেলায় শুনেছি পৃথিবী গোল। কমলালেবুর মত গোল। ওর উপর আর নিচের দিক অর্থাৎ উত্তর আর দক্ষিণ কিছুটা চ্যাপটা।

কিন্তু অনেক অনেক আগের লোক ভাবতো—পৃথিবী হলো চ্যাপটা চাকতির মত গোল। ওর উপরিভাগ একটু উত্তল—কতকটা যেন যুদ্ধকরা ঢালের উপরি ভাগের মত।

কিন্তু গোটা পৃথিবী কিসের উপর ভর ক'রে দাঁড়িয়ে আছে?

নানান দেশের মানুষ নানান ভাবে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। ভারতের লোকেরা ভাবতো—পৃথিবীর আধখানা গোল আর আধখানা সমতল। সমতল অংশটি পিঠে ক'রে চারটি হাতী দাঁড়িয়ে আছে। হাতীগুলোকে আবার পিঠে ক'রে নিয়ে আছে বিরাট একটি কাছিম। কিন্তু কাছিম কার উপর ভর ক'রে রইলো—এ নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায়নি।



পৃথিবী সম্পর্কে ভারতের লোকেরা যা ভাবতো।

রাশিয়ার লোকেরা ভাবতো—চ্যাপটা পৃথিবীকে ধ'রে রয়েছে মস্ত বড় একটা তিমি। তিমি রয়েছে জলে। কিন্তু জল রয়েছে কোথায়? তারা বলতো—জল রয়েছে পৃথিবীর মাটির উপর।

কিন্তু আসলে গোটা পৃথিবীটাই তো তিমির ওপর চাপানো। তাহলে জলের তলায় পৃথিবীর মাটি এলো কি ক'রে?



পৃথিবী সম্পর্কে রাশিয়ার লোকেরা যা ভাবতো।

এমনিধারা এলোমেলো গল্প দিয়ে গোঁজামিল দেওয়া হতো পৃথিবীর আকার এবং অবস্থিতি সম্পর্কে। কত ভুল করতো সে-যুগের মানুষ। শুধু কি সাধারণ মানুষই এ ভুল করতো? না, তা নয়। সে-যুগের যাঁরা অসাধারণ মানুষ — যাঁরা ধর্ম-মন্দিরের পুরোহিত—যাঁরা চার্চের পাদরী অথবা বিশপ, তাঁরাও ওই সব এলোমেলো কথায় বিশ্বাসী ছিলেন, আর তা প্রচারও করতেন। তাঁরা বলতেন—পৃথিবী চাকতির মত চ্যাপটা। এখন প্রমাণ হয়েছে—পৃথিবী চ্যাপটা নয়, গোল—চারদিক গোল। ওর উপর-নিচ ব'লে কিছু নেই। ফলে পৃথিবীর একদিক থেকে যাত্রা করলে আর একদিকে ফিরে আসা যায়।

মার্কোপোলো, ম্যাগেল্লান প্রভৃতি নাবিকেরা জলপথে একমুখে যাত্রা ক'রে আর একমুখে ফিরে এসেছেন একই জায়গায়। তাঁরা প্রমাণ করেছেন—পৃথিবী গোল। পৃথিবী যে গোল—একথা বোধহয় সবার আগে প্রকাশ্যে প্রচার করেন বিজ্ঞানী পিথাগোরাস। ভারতের মুনি-ঋষিরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই একথা জানতেন।

পৃথিবীর আয়তন: পৃথিবী যে গোল—একথা না হয় স্বীকার করা গেল। কিন্তু পৃথিবী কত বড়?

'বড়' কথাটি তুলনামূলক শব্দ অর্থাৎ আমার কাছে যা 'বড়', অন্যের কাছে তা 'বড়' নাও হতে পারে। যেমন, আমাদের বড়দের কাছে পাঁচ নম্বর ফুটবলটি খেলার বেশ উপযোগী; 'বড়' নয়। কিন্তু ওই ফুটবলটিই আবার ছোট ছোট ছেলেদের কাছে 'বড়' ফুটবল।

তাদের খেলার উপযোগী হল তিন নম্বর ফুটবল। ওটি আর তাদের কাছে মোটেই 'বড়' ফুটবল নয়।

আবার আমাদের দেহের তুলনায় একটা ফুটবল এমন কিছু 'বড়' নয়, কিন্তু ওই ফুটবলটি খুদে একটা পিঁপড়ের কাছে বিরাট বড়। বিরাট একটা ফুটবল খুদে একটা পিঁপড়ের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কতকটা ঠিক এমনি ব্যাপার পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের।

আমাদের হাতের কাছে এমন কোন বস্তু নেই যার সঙ্গে তুলনা করে এখুনি বলা যায়—পৃথিবী অমুক বস্তুর মত বড়। পৃথিবীই তো সব কিছুকে ধ'রে রেখেছে। তাই তাদের দিয়ে পৃথিবী কত বড় বোঝা যাবে কেন? পৃথিবী কতো বড় বুঝতে হলে আমাদের অন্য পথে যেতে হবে। সংখ্যা দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু কোন্ সংখ্যা নেবো?

'মিলিয়ান' কথাটি অনেকেরই বোধহয় শোনা। মিলিয়ান মানে দশ লক্ষ। কিন্তু সেটাই তো যথেষ্ট নয়। আসলে সংখ্যাটি কতো বড় তার একটা বোধ থাকা চাই।

'মিলিয়ান'কে বোঝার জন্য একজন বিজ্ঞানী সুন্দর এক পদ্ধতি বাতলেছেন:

বড় বড় একশোখানি সাদা কাগজ নিয়ে প্রতিটিতে একশোটি ক'রে লাইন টানা হলো। তারপর প্রতি লাইনে একশোটি বিন্দু বসানো হলো। তাহলে একখানি পাতায় মোট বিন্দু হলো 100 × 100 অর্থাৎ 10,000 (দশ হাজার)। এখন ওই একশোখানি পাতা যদি ওই ভাবে পূর্ণ ক'রে ক্লাশের চার-দেওয়ালে টাঙ্গানো যায়, তাহলে এক মিলিয়ান বিন্দু আমাদের চোখে পড়বে।

কাগজ নিয়ে কেউ এক মিলিয়ান বিন্দু বসাবে নাকি। তাহলে আগে থেকে বলে দিই—প্রতি সেকেণ্ডে তিনটি ক'রে বিন্দু বসালে, একনাগাড়ে একশোখানি কাগজ পূর্ণ ক'রতে মোট 72 ঘণ্টা সময় লাগবে তোমাদের।

তাদের

এ-তো গেলো এক মিলিয়ানের কথা, কিন্তু হাজার মিলিয়ান কত?

ক্লাশে যদি 50 জন ছাত্র থাকে এবং তারা যদি একনাগাড়ে দিনে ছ'ঘণ্টা ক'রে খাতা গুণতে পারে এবং প্রত্যেকে প্রতি ঘণ্টায় যদি 3 হাজার ক'রে খাতা গোণে তাহলে হাজার মিলিয়ান খাতা গুণে শেষ করতে 50 জন ছেলের সময় লাগবে তিন বছরের বেশী।

হাজার মিলিয়ান সাধারণ পেনসিল যদি একটার পর একটা সার বেঁধে সাজানো হয়, তাহলে সেই পেনসিলের লাইন গোটা পৃথিবীকে চারবারের বেশী বেড় দেবে।

হাজার মিলিয়ান পেনসিলের মাল-মসলা দিয়ে শুধু যদি একটা মাত্র পেনসিল বানানো সম্ভব হয়, তাহলে তার দৈর্ঘ্য হবে 180 মিটার; প্রস্থ হবে 6½ মিটার এবং ওজন 7000 টন। পাইপের মত পেনসিলটি ফাঁকা করতে পারলে সেখানে প্রায় পোনেরটি একতলা বাড়ী বসানো চলবে। আর সেই বাড়ীতে অন্তত 100 জন লোক বাস করতে পারবে মহাসুখে।

এবারে আমরা পৃথিবী কত বড় বুঝবার চেষ্টা করি।

পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত একটা কুয়ো খুঁড়লে সেটা হবে 6380 কিলোমিটার গভীর। এখন প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার হিসাবে দিনে-রাতে না থেমে একনাগাড়ে সিঁড়ি বা মই বেয়ে কুয়োতে নামবার চেষ্টা করলে তলায় পৌঁছুতে সময় লাগবে প্রায় ছ'মাস।

অবশ্য এতো গভীর কুয়ো খোঁড়া সম্ভব নয়। কেননা সবচেয়ে গভীর খনিগুলি ছ' কিলোমিটারের বেশি গভীর করা যায় না। পৃথিবীর এই ছয় কিলোমিটার গভীরে এতই তাপ যে সেখানে স্বাভাবিক অবস্থায় কোন জীবই জীবন্ত অবস্থায় থাকতে পারে না। সেখানের প্রচণ্ড তাপে সবকিছু ঝল্‌সে যাবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখেছেন, সাধারণত প্রতি 33 মিটার গভীরে এক ডিগ্রী তাপ বেড়ে চলে।

সে-যা-হোক পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6380 কিলোমিটার, তার মানে ব্যাস 6380 × 2 = 12760 কিলোমিটার।



পৃথিবীর ব্যাসার্ধ

কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগের আয়তন কত?

এক কিলোমিটার বাহু নিয়ে যদি এক একটা বর্গক্ষেত্র তৈরী করা যায়, তাহলে সেই বর্গক্ষেত্রের আয়তন হবে 100 হেকটারের সমান। এখন পৃথিবীর উপরিভাগের মোট আয়তন হলো 50,000 মিলিয়ান হেকটার। এই বৃহৎ আয়তনের প্রতি দশভাগের সাত ভাগ হলো জল আর তিন ভাগ শুধু স্থল।

পৃথিবীর ভর: জল আর স্থল মিলিয়ে গোটা পৃথিবীতে কতটুকু বস্তু আছে—সেটাও নিশ্চয়ই এই প্রসঙ্গে জানতে হবে।

পৃথিবীতে কতটুকু বস্তু আছে, মানে পৃথিবীর 'ভর' কতটুকু?

আসলে কোন বস্তুর ভর হলো কি পরিমাণ উপাদান দিয়ে সেই বস্তুটি তৈরী। পৃথিবীর ভর মানে কি পরিমাণ উপাদান দিয়ে পৃথিবী তৈরী হয়েছে।

পৃথিবীতে এতো বেশী পরিমাণ বস্তু আছে যে তা কল্পনা করাও কঠিন। তবুও আমাদের জানতে হবে বৈকি। ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে জানা যাক।

মনে করি, পৃথিবীকে বিশ্বজগতের অন্য একটা জায়গায় সরানো হবে। এখন গোটা পৃথিবী কেটে-কুটে টুকরো ক'রে মালগাড়ীতে বোঝাই করা হলো। এক-একটা মাল গাড়ীতে একশো টন ক'রে বস্তু ধরলো। তারপর মনে করি, মালগাড়ীগুলোর এঞ্জিন ছাড়বে।

কিন্তু মোট কতোগুলো মালগাড়ীর প্রয়োজন হয়েছে, অনুমান করতে পার কি ?

সংখ্যা দিয়ে বললে বুঝতে হয়তো অসুবিধে হবে। অন্য উপায়ে বলি : _

পৃথিবীর অবস্থান থেকে শেষ মালগাড়ীটি যখন ছাড়বে, তখন প্রথম মালগাড়ীটি সুদূর নক্ষত্রের এলাকায় পৌঁছে যাবে।

আলোর গতি বোধহয় জানা নেই। আলোর গতি হলো প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। কি সাংঘাতিক বেগ !

'কি সাংঘাতিক বেগ'—এই কথাটুকু বলতে যে সময় লাগবে, সেই সময়ের অবসরে আলোর রশ্মি পৃথিবীকে আট পাক দিয়ে আসবে। 'চাঁদ কতো দূরে' এই কথা শেষ হতে না হতেই আলোর রশ্মি চাঁদে গিয়ে পৌঁছে যাবে।

এখন পৃথিবীবাহী ট্রেনের শেষ মালগাড়ী থেকে গার্ড সাহেব এঞ্জিন চালককে যে আলোর সংকেত দেবে, সেই আলোর রশ্মি চালকের কাছে পৌঁছতে ষাট হাজারের বেশী বছর সময় নেবে। তাহলে এখন বোঝ, পৃথিবীর ভর বলতে কি পরিমাণ বস্তু বোঝায়।

আরো একভাবে ব্যাপারটা চিন্তা করা যেতে পারে। মালগাড়ীর সংখ্যা এতো বেশী যে, প্রতি বিশ হাজার মিলিয়ান মালগাড়ীর জন্য একটি ক'রে গার্ড রাখলে মোট গার্ডের সংখ্যা হবে 250 কোটি লোক। আসলে পৃথিবীতে যত লোক আছে, তাদের সকলকেই গার্ডের কাজে যোগ দিতে হবে !

এখন নিশ্চয়ই কিছুটা অনুমান হচ্ছে কি পরিমাণ বস্তু পৃথিবীতে আছে অর্থাৎ পৃথিবীর ভর কতো।

পৃথিবীর দিনরাত্রি : পৃথিবীর আকার, আয়তন এবং ভর জানা গেল। এবারে জানবো পৃথিবীতে কি ভাবে দিন-রাত হয়।

দিন ও রাত্রি শব্দ দুইটির অর্থ নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না। অন্ধ ছাড়া আর সবার জানা আছে দিন-রাত কি। এমন কি অবলা জীব পর্যন্ত বোঝে, কখন দিন হয় আর কখন রাত হয়। পাখীর

কথাই ধরা যাক। রাত হতে-না-হতেই তারা আপন আপন বাসায় ফেরে, আবার সকাল হতে-না-হতেই আপন সুরে গান শুরু করে। তেমনি সারাদিন মাঠে-ঘাটে চ'রে রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসতে না-আসতেই গরু, ছাগল, ভেড়া সবাই আপন আপন ঘর-মুখী হয়।

জ্ঞান হওয়ার সাথে সাথে আমরা দিন-রাতের সঙ্গে পরিচিত। দিন-রাত যেন আমাদের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। অথচ দিন-রাত কেন হয়, অনেকের হয়তো জানা নেই। এখন সে কথাই একটু আলোচনা করা যাক।

দিন-রাত মানেই তো আলো আর আঁধার। আলো আছে ব'লেই দিন, আর আলো নেই ব'লেই রাত। এই আলোর উৎস হলো সূর্য। সূর্য যদি না থাকতো, তাহলে দিন ব'লে কিছুই থাকতো না। হঠাৎ যদি কোন সময় সূর্য নিভে যায়, তাহলে তখুনি শুরু হবে রাতের আঁধার। রাতের আঁধারেই ডুবে থাকতে হবে আমাদের চিরকাল। দিনের মুখ আর দেখবো না কোনদিন।

শুনে বুঝি ভয় হয়। আপাতত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সূর্য নিভে যাওয়ার এমন কোন কারণ ঘটেনি এখনও এবং সুদূর ভবিষ্যতেও সে-রকম কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। সূর্য যখন আকাশে থাকে, তার মানে সূর্য থেকে যখন আলো আসে আমাদের কাছে, তখন হয় দিন, আর সূর্য যখন আকাশে থাকে না অর্থাৎ যখন তার আলো আসে না, তখন হয় রাত। অবশ্য এই তথ্যটুকু সবার জানা। কিন্তু দিন রাত কেন হয়? অর্থাৎ সূর্য কেন ওঠে, কেনই বা ডোবে? আর ডুবলে যায় কোথায়?

সকাল বেলায় সূর্যকে উঠতে দেখি সবাই। ধীরে ধীরে মাথার উপর ওঠে—এও দেখি। আরো দেখি, সূর্য মাথার উপর থেকে ধীরে ধীরে নামতে নামতে শেষে এক সময় মাটি ফুঁড়ে যেন তলিয়ে যায়। পরের দিন আবার মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে। এটা আমরা দেখি, আমাদের আগের মানুষও দেখতো। পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হয়েই সূর্যের ওঠা-নামা দেখে আসছে। মানুষ দেখে আসছে—সূর্য পূর্ব

দিকে ওঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এর ব্যতিক্রম কোনদিন হয়নি। আগামী দিনে হবে কিনা আগামী কালের মানুষ জানবে।

সূর্য কেন ওঠে, কেনই-বা নামে, তা জানবার আগে আমাদের জানতে হয়, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, সেই পৃথিবীর আকার কেমন? পৃথিবী যে গোল—এ কথা তো আগেই আমরা জেনেছি। কিন্তু এ জন্য দিন-রাত হবে কেন?

কেন হবে না?

ব্যাপারটা তো বেশ সোজা হলো এখন। ধরা যাক, পৃথিবীর চারদিকে সূর্য চক্কর দিচ্ছে। যখন আমাদের দিকে সূর্য থাকে তখন আমাদের দিকে দিন, অপর দিকে রাত। আর যখন অপর দিকে সূর্য থাকে, তখন সে দিকে দিন, রাত আমাদের দিকে।

কিন্তু সূর্য যে পৃথিবীর চারদিকে চক্কর দিচ্ছে—এ কথা কেউ আজ আর বিশ্বাস করে না, মুখেও বলে না কেউ। সবাই এখন জানে—সূর্য স্থির; পৃথিবীই ঘুরছে বা চক্কর দিচ্ছে সূর্যের চারপাশে।

অথচ এমন একদিন ছিলো যখন কেউ এ কথা বিশ্বাসই করতো না। কেননা; ধর্মশাস্ত্রে লেখা রয়েছে—সূর্যদেব অর্থাৎ হিলিয়াম—



সূর্যদেব সূর্য-ঘোড়ায় চেপে আকাশপথে ভ্রমণ করেন।

রোমান ভাষায় 'এ্যাপোলো'—প্রতিদিন সকালবেলায় সূর্য-ঘোড়ায়

চেপে আকাশ পথে ভ্রমণ করেন। আর সন্ধ্যা বেলায় চলে যান তিনি মাটির তলায়। ঘোড়াগুলো তখন জিরিয়ে নেয়। আবার যাত্রা শুরু হয় পরের দিন ভোরে।

কিন্তু সে যুগের মহাপণ্ডিত এ্যারিস্‌টটল প্রচার করলেন :

সূর্য হলো একটি জ্যোতিষ্ক ; পৃথিবীর চারদিকে চক্কর দিচ্ছে আর পৃথিবী স্থির।

এই প্রচারে দেশের লোক খেপে গেল। তারা বলল :

এ্যারিস্‌টটল বিধর্মী নইলে বলে কিনা সূর্য হলো একটা জ্যোতিষ্ক, আপনা থেকেই পৃথিবীকে পাক দেয়। যত সব অধর্মের আর অনাচারের কথা!

তাই বৃদ্ধ বয়সে এ্যারিস্‌টটলকে স্বদেশ ছেড়ে পালাতে হয় বিদেশে। সেখানেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। কিন্তু আজ সবাই জেনেছে সত্য সত্যই সূর্য একটি জ্যোতিষ্ক।

এ্যারিসটটলের মৃত্যুর পাঁচশো বছর পর আরো একজন গ্রীক পণ্ডিত সূর্য এবং পৃথিবী সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য দিয়াছিলেন। তিনিও বলেছিলেন পৃথিবী স্থির, আর সূর্য তার পাশে পাশে পাক দিচ্ছে। ফলে দেশের লোকও চৌদ্দশ' বছর পর্যন্ত এই গ্রীক পণ্ডিত টলেমীর কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করেছিলো।



নিকোলাওস কোপারনিকাস
[1473—1543]

কিন্তু ষোল শতকের প্রথম দিকে 1513 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী কোপারনিকাস সর্বপ্রথম বললেন যে, পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র নয় ; অন্যান্য গ্রহের মত একটি গ্রহ মাত্র। শুধু তাই নয় ; পৃথিবী

লাটিমের মত নিজের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কোপারনিকাসের মতবাদ সে-যুগের ধর্ম-বিশ্বাসী মানুষের মনে এতই বিরোধী ছিল যে, পাদরী আর বিশপদের হাত থেকে নির্যাতন পাওয়ার ভয়ে তিনি সে কথা আর মুখ ফুটে বললেনই না। তাঁর ছাত্ররা এই নতুন তথ্য চুপি চুপি ছাপিয়ে যখন তাঁর কাছে নিয়ে এলো, তখন তিনি মৃতুশয্যায় শুয়ে। সূর্য এবং পৃথিবী সম্পর্কে নতুন তথ্য বুকে নিয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বিজ্ঞানী কোপারনিকাস।



জিওদারনো ব্রুনো [1548—1600]

সূর্য ও পৃথিবী সম্পর্কে নতুন মতবাদের জন্য চরম আঘাত পেতে হয়েছিলো জিওদারনো ব্রুনোকে। কোপারনিকাসের তত্ত্ব তিনি প্রচার করেছিলেন ব'লে তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হয়। এমন কি গ্যালিলিওর মত বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীকেও এজন্য কম নির্যাতন ভোগ করতে হয়নি। মৃত্যুর ভয়ে তাঁকে হাঁটু গেড়ে বৃদ্ধ বয়সে মিথ্যে কথা বলতে হয়েছিল। বলতে হয়েছিল—পৃথিবী স্থির এবং সূর্য তার চারপাশে ঘুরছে। কিন্তু সভ্য জগতের মানুষকে একদিন স্বীকার



গ্যালিলিও গালিলেই
[1564—1642]

করতে হয়েছে—সূর্যই স্থির, পৃথিবী নিজেই পাক খেতে খেতে সূর্যের চারপাশে চক্কর দিচ্ছে।

নিজের চারপাশে পাক খাওয়াকে পৃথিবীর 'আহ্নিক গতি' বা 'পরিক্রমণ' বলে। আর সূর্যের চারপাশে পাক খাওয়াকে বলে 'বার্ষিক গতি' বা 'পরিভ্রমণ'।

পরিক্রমণ বা আহ্নিক গতির জন্যই পৃথিবীতে দিন-রাত হয়। পরিক্রমণ না থাকলে এভাবে দিন-রাত হতো না।

এই প্রসঙ্গে আরো একটু জানা দরকার :

পৃথিবী একটু হেলে আছে সূর্যের দিকে। তার মানে পৃথিবীর অক্ষরেখা সমতলের ওপর লম্বভাবে দাঁড়িয়ে নেই; একটু বেঁকে আছে। অক্ষরেখার এই বাঁকনের জন্যই কখনো রাত বড়, দিন ছোট; কখনো দিন বড়, রাত ছোট। কখনো-বা দিন-রাত সমান সমান। তবে দিন-রাত একত্রে মিলে সেই নির্দিষ্ট সময় প্রায় 24 ঘণ্টা। কেননা 24 ঘণ্টাতেই পৃথিবী নিজের চারপাশে এক পাক খায়। হয়তো এখন প্রশ্ন হতে পারে—সূর্য যদি স্থির হয় এবং পৃথিবী যদি পাক খায়, তাহলে সূর্যকে আমরা চলতে দেখি কেন? আর কেনই-বা পৃথিবীর পাক খাওয়া বুঝতে পারি না?

কেন আবার? চলন্ত ট্রেনে চলবার সময় মনে হয় হয় না পাশের গাছগুলো সব পিছু হটছে? আসলে তো ট্রেনই সামনে ছোটে, গাছগুলো পিছু হটে না। এ তো শুধু চোখের ভুল।

পৃথিবীর পাক খাওয়া আমরা বুঝতে পারি না। কারণ, আমাদের তুলনায় পৃথিবীর আয়তন খুব বেশী এবং আয়তনের তুলনায় পৃথিবীর পাক খাওয়ার হারও খুব কম।

এখন তাহলে দিন-রাত হওয়ার কারণ বুঝলে তো? মূল কথা হলো—নিজের চারদিকে পাক খাওয়া এবং সূর্যের আলো—এই দুয়ে মিলিয়েই পৃথিবীর দিন-রাত।

ঋতু চক্র : আলোর সামনে কোন বস্তু রাখলে সেই বস্তুর একটা ছায়া পড়ে। আলো যে দিকে থাকে তার বিপরীত দিকে এই ছায়ার

সূর্য-
বস্তুটি
উ
পোঁতা
করা হল
বা
দুপু
লাঠিটির
গেল, সূ
তত ব
সব থে
ছায়াটি
ডোবার
এবং মা
অ
এমন কি
বিশ্ববিখ্যাত
এজন্য কম নি
করতে
তাঁকে হ
মিথে
ছিল
পৃ

সৃষ্টি হয়। আলো-ছায়ার এই তথ্যটুকু আমরা সবাই জানি। সূর্য-কিরণের গতি-পথে কোন বস্তু রাখলে সূর্যের বিপরীত দিকে বস্তুটির একটি ছায়া পড়ে। পরখ করে আমরা দেখতেও পারি।

উঠানের মাঝামাঝি জায়গায় একদিন একটা লাঠি খাড়াভাবে পোঁতা হল। পরের দিন সূর্য ওঠার আগে থেকেই পর্যবেক্ষণ সুরু করা হল। আমরা এখন কি দেখবো?

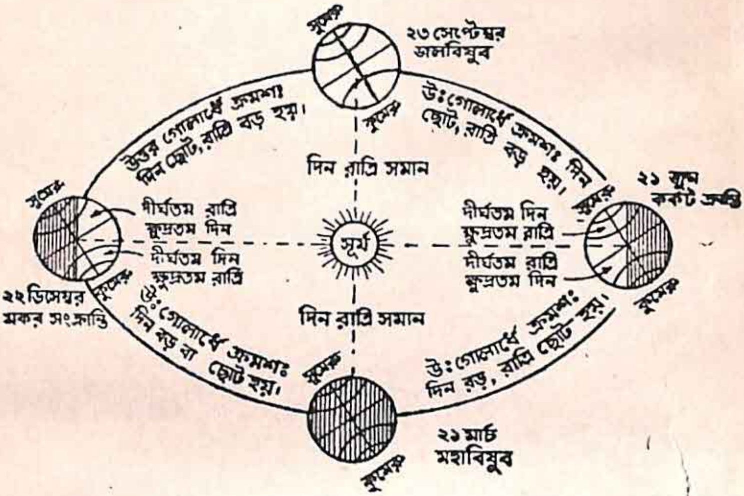
দেখবো যে, সূর্য উঠামাত্র তার বিপরীত দিকে লাঠির ছায়া পড়ল। তারপর বেলা যত বাড়তে থাকল ছায়ার দৈর্ঘ্যও তত কমতে লাগল। শেষে ঠিক মাঝ-দুপুরে অর্থাৎ কিনা দুপুর ঠিক বারোটায় ছায়াটি সব থেকে ছোট হল।

দুপুরের পর সূর্য হেলে পড়ল পশ্চিম আকাশে। সেই সঙ্গে লাঠির ছায়া সূর্যের বিপরীত দিকে পড়তে লাগল। আরো দেখা গেল, সূর্য যত নিচের দিকে নামতে সুরু করল, লাঠিটির ছায়াও তত বাড়তে থাকল। শেষে সূর্য ডোবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ছায়াটি সব থেকে লম্বা হল। শুধু তাই নয়। সূর্য উঠার ঠিক পর মুহূর্তেও ছায়াটি এমনি লম্বা হয়েছিল। আসলে সূর্য উঠার সময় ও সূর্য ডোবার সময় ছায়ার দৈঘ্য সবথেকে লম্বা এবং একই মাপের। এবং মাঝ-দুপুরের ছায়া সব থেকে ছোট।

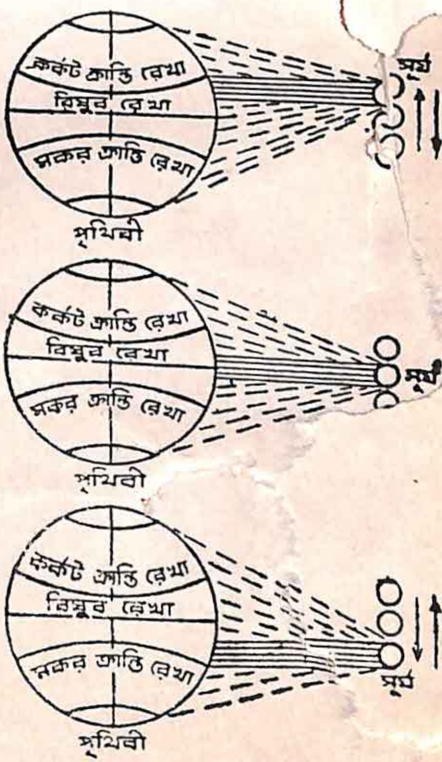
কয়েক দিন লক্ষ্য করলে আরো দেখা যাবে—প্রতিদিন কিন্তু ঠিক একই জায়গায় সূর্য উঠছে না এবং ডুবেও না। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত প্রতিদিনই সরে সরে যাচ্ছে। দেখা যাবে শীতকালের সূর্য দক্ষিণ ঘেঁষে উঠছে। যে সময় দক্ষিণ দিকের বারান্দায় রোদ বেশী। কিন্তু উত্তর দিকের বারান্দায় ছায়া। এরই নাম সূর্যের দক্ষিণায়ন।

সূর্যের এই দক্ষিণায়ণের জন্য উত্তর গোলার্ধে অর্থাৎ আমরা পৃথিবীর যে গোলার্ধে বাস করি সেই গোলার্ধে দিন সব চেয়ে ছোট এবং রাত্রি সব চেয়ে বড়। ক্ষুদ্রতম দিন ও দীর্ঘতম রাত্রি হল 21শে ডিসেম্বর। এর বিপরীত ঘটনা দক্ষিণ গোলার্ধে। সেখানে

তখন দীর্ঘতম দিন এবং ক্ষুদ্রতম রাত্রি। 21শে ডিসেম্বর সূর্যের যেখানে অবস্থান তাকে বলে **মকর ক্রান্তি বৃত্ত**।



পরের দিনই মকর ক্রান্তি বৃত্ত থেকে সূর্য বিষুব-রেখার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। বিষুব-রেখার উপর এসে পৌঁছায় 21শে মার্চ। এ-দিন দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান।



21শে মার্চের পর সূর্য বিষুব-রেখা থেকে আরো উত্তরে সরে যেতে থাকে। ফলে এই গোলার্ধে তখন দিন বড়, রাত্রি ছোট। সূর্যের এই গতির শেষ সীমা 21শে জুন। এইদিন উত্তর গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি। ঠিক এর বিপরীত দক্ষিণ গোলার্ধে।

সেখানে সেদিন ক্ষুদ্রতম দিন। দীর্ঘতম রাত্রি। উত্তর গোলার্ধে সূর্যের গতির এই শেষ সীমাকে বলে **কর্কট ক্রান্তি বৃত্ত**।

পরের দিনই কর্কট ক্রান্তি বৃত্ত থেকে সূর্য আবার বিষুব-রেখার দিকে যাত্রা সুরু করে। 23শে সেপ্টেম্বর সূর্য এসে পৌঁছায় বিষুব রেখায়। এদিন আবার দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান। 23শে মার্চ দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান।

23শে সেপ্টেম্বরকে বলে 'জল বিষুব' আর 21শে মার্চকে বলে 'মহা বিষুব'।

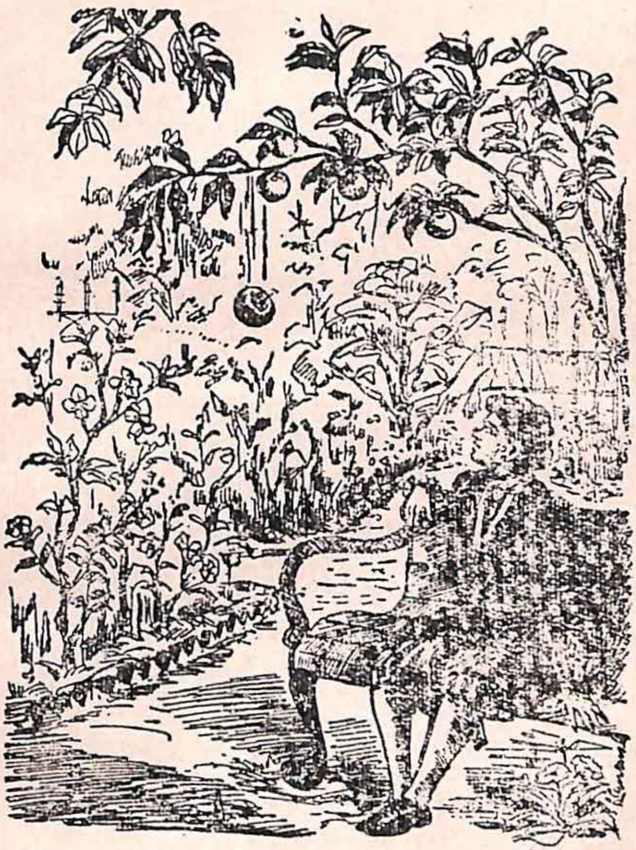
বিষুব-রেখা থেকে কর্কট ক্রান্তি বৃত্ত পর্যন্ত যাওয়া এবং সেখান আবার বিষুব রেখায় ফিরে আসাকে সূর্যের **উত্তরায়ণ** বলে। সূর্যের এই ভ্রমণে সময় লাগে ছ'মাস। উত্তরায়ণের পর সূর্যের যাত্রা সুরু হয় দক্ষিণ গোলার্ধে। সেখানে মকর ক্রান্তি বৃত্ত পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসে বিষুব রেখায়। সূর্যের এই ছ'মাসের ভ্রমণকে বলে **দক্ষিণায়ণ**।

কর্কট ক্রান্তি বৃত্ত থেকে মকর ক্রান্তি বৃত্ত পর্যন্ত সূর্যের এই যে যাতায়াতের কথা বলছি—যার ফলে শীত গ্রীষ্ম আসছে, ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে—আসলে কিন্তু সূর্য যাতায়াত করছে না, সূর্যের কোন গতি নেই। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর চক্কর দেওয়ার জন্য ঋতুচক্র ঘটছে।

দিন রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি হচ্ছে সূর্য তাপের তারতম্যের জন্য। আর সূর্যতাপের তারতম্য হচ্ছে পৃথিবীর মেরুদণ্ড লম্বভাবে নেই, একটু হেলে আছে বলে। এরই জন্য শীত গ্রীষ্ম—এরই জন্য বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত। তাই বার মাসে ছয় ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত পর পর ফিরে ফিরে আসে। একেই বলে ঋতু-চক্র। এই ঋতু চক্রের মূলে পৃথিবীর বার্ষিক গতি সূর্য পরিভ্রমন।

পৃথিবীর আকর্ষণ বা অভিকর্ষঃ প্রতিনিয়ত পৃথিবী পাক খায়। অথচ পৃথিবী থেকে আমরা পড়ে যাই না কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের আরো কিছু জানতে হয়। বৃষ্টির জল মাটিতে পড়ে। গাছের ফল সেও বোঁটা খস্‌লে মাটিতে পড়ে। উপর দিকে ঢিল ছুঁড়লে ঢিলটিও কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে এসে পড়ে। 'হাই মারলে' বা 'হেড করলে' বলটি শেষে মাটিতেই



আপেলটি আকাশে না উঠে মাটিতে পড়লো কেন?

পড়তে থাকে। এই সহজ কথাগুলি নতুন ক'রে বলার প্রয়োজন নেই। আমরা জানি। আমাদের আগের মানুষ জানতো। তারো আগের মানুষ জানতো। জ্ঞান হওয়ার পর যখনই মানুষ উপর থেকে কিছু পড়তে দেখেছে, তখন থেকেই মানুষ জানে পৃথিবীর সব কিছুই মাটিতে পড়ে। কিন্তু 'কেন পড়ে' তার কারণ মানুষের জানা ছিল না। পড়তে দেখেই মানুষ সন্তুষ্ট হয়েছিল। কেন যে পড়ছে, তার

কারণ কোনদিন অনুসন্ধান করেনি। এভাবে চলে এসেছে হাজার হাজার বছর।

কিন্তু এই সেদিন, মাত্র তিনশো বছর আগে, এক তরুণ যুবক বসেছিলেন এক ফলের বাগানে। হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে দিয়ে একটা পাকা আপেল বোঁটা খ'সে মাটিতে পড়লো। অমনি তিনি আনমনা হলেন। ভাবলেন মনে মনে, আপেলটি আকাশে না উঠে মাটিতে পড়লো কেন? এর উত্তর পাবার জন্য যুবকের মন তোলপাড় ক'রে উঠলো। দিনের পর দিন তিনি ভাবতে লাগলেন। শেষে সব জিনিসই উপর থেকে মাটিতে পড়তে দেখে যুবকটি অনুমান করলেন—'পৃথিবী সব বস্তুকেই নিচের দিকে টানে'। তাঁর কথাটি অতি সাধারণ। কিন্তু এর তাৎপর্য অতি অসাধারণ। তরুণ যুবকের মতবাদ সারা বিশ্ব একদিন মেনে নিল। সেই যুবক হচ্ছেন—বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যর আইজ্যাক নিউটন।

নিউটনের মতবাদ গুছিয়ে বললে দাঁড়ায়—'পৃথিবীর একটা আকর্ষণ ক্ষমতা আছে'। এই আকর্ষণের ফলেই সবকিছু মাটির দিকে আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর এই আকর্ষণের ক্ষমতাকে বলে—অভিকর্ষ। অভিকর্ষ আছে বলেই বৃষ্টির জল মাটিতে পড়ে। গাছের ফলও মাটিতে পড়ে। সব কিছুই পড়ে মাটির উপর।

পৃথিবীর এই আকর্ষণের মত অন্য গ্রহের আকর্ষণ আছে কি?

হ্যাঁ, আছে। শুধু গ্রহ কেন, প্রতিটি উপগ্রহ এবং তাদের পিতামহ সূর্য সবারই আকর্ষণ ক্ষমতা আছে। পৃথিবী আর সূর্য, এদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ আছে বলেই সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে। বুধ আর শুক্র যে, সূর্যের চারপাশে ঘুরছে, তার মূলেও ওই আকর্ষণ। শুধু-বা এরাই কেন? প্রতিটি গ্রহের সঙ্গে সূর্যের একটা পারস্পরিক আকর্ষণ আছে। একমাত্র এজন্যই গ্রহগুলো নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। আবার চাঁদ ও পৃথিবী উভয়ের মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে ব'লেই পৃথিবীর চারপাশে চাঁদ ঘুরছে। একটা জ্যোতিষ্কের প্রতি আর একটা

জ্যোতিষ্কের এই যে টান বা আকর্ষণ, একেই বিজ্ঞানের ভাষায় 'মহাকর্ষ' বা 'মাধ্যাকর্ষণ বলে। মাধ্যাকর্ষণকে অনেক সময় আমরা 'অভিকর্ষ' বলি। অভিকর্ষ মহাকর্ষেরই একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র। পৃথিবীর বস্তুর প্রতি পৃথিবীর যে টান বা আকর্ষণ, সেটাই পৃথিবীর লোকের কাছে অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ।

দুটি বস্তুর মধ্যে কতটুকু টান থাকবে তা নির্ভর করে—বস্তু দুটি পরস্পরের মধ্যে কত দূরে আছে এবং ওদের পরিমাণ কত--তার ওপর। দূরত্ব যত কম হবে, টান তত বেশী হবে। আর দূরত্ব যত বেশী হবে, টান তত কম হবে। পৃথিবী আর চাঁদের মধ্যে যতটুকু টান, তা আরো বেশী হতো যদি ওরা কাছাকাছি থাকতো অথবা টান আরো কম হতো, যদি ওরা আরো দূরে থাকতো। আবার, পৃথিবী ও চাঁদ—এদের উভয়ের অথবা কারো একার 'ভর' বেশী হলেও টানের পরিমাণ বেশী হতো। অপরপক্ষে 'ভর' কম হলে, টানও কম হতো।

আরো একটা কথা, দুটি বস্তুর মধ্যে যার 'ভর' বেশী তারই টান বেশী। চাঁদের ভরের তুলনায় পৃথিবীর ভর অনেক বেশী। এজন্য চাঁদ যত জোরে পৃথিবীকে টানছে, তার থেকে অনেক বেশী জোরেই পৃথিবী টানছে চাঁদকে। চাঁদের তুলনায় পৃথিবীর টানের পরিমাণ অনেক বেশী ব'লেই পৃথিবী তার চারপাশে চাঁদকে ঘোরাতে পারছে। তেমনি যে কোন গ্রহের ভর অপেক্ষা সূর্যের ভর অনেক বেশী। তাই গ্রহদের প্রতি সূর্যের টান-ও বেশী। ফলে সূর্যেরই চারপাশে গ্রহগুলো অবিরত ঘুরছে।

পৃথিবীর ওজন ঃ 'ওজন' কথাটি কারো অজানা নয়। এমন কি, কিভাবে ওজন করতে হয়, তাও সকলে জানি। তাই ওজন করা সম্পর্কে বলার কিছু নেই। বলতে চাই ওজন কাকে বলে।

কোন বস্তুর ওজন হল—সেই বস্তুর প্রতি পৃথিবীর টানের পরিমাণ। তাই কোন বস্তুর ওজন নির্ভর করে, সেই বস্তুর প্রতি পৃথিবীর টান বা অভিকর্ষের পরিমাণের ওপর। আবার এই টান নির্ভর করে, বস্তুর ভর কতটুকু তার ওপর। কাজেই, কোন বস্তুর

ভর বেশী হলে, তার টান বেশী হয় এবং টান বেশী হলে ওজনও বেশী হয়। অপরপক্ষে ভর কম হলে, টান কম হয় এবং টান কম হলে, ওজনও কম হয়। বুধ-গ্রহে গেলে আমাদের ওজন কম হবে কেন, তা এখন নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে।

পৃথিবীর ওজন কত জান ?

পৃথিবীর ওজন প্রায় $1{\cdot}7 \times 10^{24}$ মণ বা 6×10^{27}গ্রাম

মঙ্গল গ্রহ

বৈজ্ঞানিকগণ সব থেকে বেশী মাথা ঘামিয়েছেন মঙ্গল গ্রহকে নিয়ে। পৃথিবীর নিকট প্রতিবেশী এই মঙ্গল-গ্রহে কোন বাসিন্দা আছে কিনা প্রমাণ করাই বিজ্ঞানীদের আসল উদ্দেশ্য। এখনও বিশ্বের নাম-করা বৈজ্ঞানিকগণ মঙ্গলের নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্য কত কলা-কৌশল করছেন। রকেটে পুরে সেখানে মানুষ পাঠাবার চিন্তা করছেন। মঙ্গল-গ্রহের নতুন খবর শুনবার জন্য কে-না উৎসুক !

ক'বছর আগেই 'উড়ন্ত চাকী' নিয়ে কত হৈচৈ হলো। কত লোক বললো—উড়ন্ত চাকীতে চেপে মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা নেমে এসেছে পৃথিবীতে। আসলে কিন্তু এসব কথা একেবারে গাল-গল্প। তবুও আমরা উৎসাহর সঙ্গেই শুনি। কারণ, আমরা জানতে চাই, সত্যই মঙ্গল-গ্রহে আমাদের মত কোন বাসিন্দা আছে কিনা ?

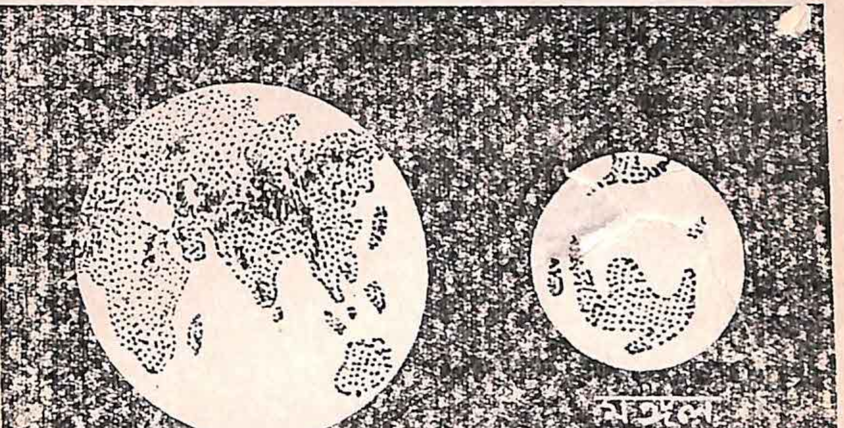
মঙ্গলে মানুষ আছে কিনা—এর জবাব এখনও পাওয়া যায় নি। তবে বিজ্ঞানী মহলের ধারণা, পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও যদি মানুষ বা মানুষের মত কোন জীব বাস করে তো সে হল মঙ্গল গ্রহ। কারণ, জীবের জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সেখানে হয়তো আছে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মত মঙ্গল-গ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে। কিন্তু এই স্তর অত্যন্ত পাতলা। এজন্য সেখানে বায়ুর চাপও কম। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের যে চাপ তার দশভাগের একভাগ মাত্র। ভূপৃষ্ঠ থেকে 18 কিলোমিটার ওপরে যে রকম বায়ুর চাপ ঠিক তেমনি

বায়ুর চাপ মঙ্গলের উপর। বায়ুর চাপ এত কম হওয়া জীব-জন্তুর পক্ষে কষ্টদায়ক সন্দেহ নেই। তাই ব'লে একেবারে অসহনীয় নয়। কম চাপের বায়ুতেও মানুষ পাহাড়-পর্বতে এবং আকাশে ওঠে, আবার সেখান থেকে নেমে আসে নিচে। সত্যই যদি মঙ্গল-গ্রহে প্রাণী বাস করে, তবে তারা নিশ্চয়ই কম চাপের বায়ুতে বাস ক'রে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া বায়ুর তাপমাত্রাও একটা বিরাট কিছু অস্বাভাবিক নয়। মোট কথা, মঙ্গল-গ্রহের পরিবেশ প্রাণী-বাসের অনুপযুক্ত একথা বলা যায় না। কিন্তু মঙ্গলে কোন প্রাণী আছে কিনা এবং থাকলেও কি ধরণের প্রাণী আছে, তার সঠিক খবরের জন্য আমাদের আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

মঙ্গলের আকার-আকৃতি সম্পর্কে এবারে কিছু বলি।

মঙ্গল ছোট একটি গ্রহ। ব্যাস মাত্র 6774 কিলোমিটার। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক। পৃথিবীর নিকট প্রতিবেশী হলেও আয়তনে



পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় মঙ্গলের আয়তন

মঙ্গল পৃথিবী থেকে অনেক ছোট। সাতটা মঙ্গল একত্রে একটা পৃথিবীর সমান। ওজনে পৃথিবীর ওজনের প্রায় $\frac{1}{10}$ অংশ। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি (অভিকর্ষ) থেকেও মঙ্গলের আকর্ষণ শক্তি

প্রায় আড়াই গুণ কম। 100 কিলোগ্রাম ওজনের একটা বস্তু পৃথিবী থেকে মঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ওজন করতে পারলে দেখা যাবে, সেখানে 38 কিলোগ্রাম হয়ে গেছে। পৃথিবীর 365 দিনে এক বছর; কিন্তু মঙ্গলের বছর 669 পৃথিবী-দিনে। তার মানে 669 পৃথিবী-দিনে মঙ্গল সূর্যের চারপাশ দিয়ে একবার ঘুরে আসে।

পৃথিবীর মতই মঙ্গল-গ্রহে দিন-রাত হয়। আপন অক্ষরেখার উপর আবর্তন-কাল প্রায় পৃথিবীর মত 24 ঘণ্টা 37 মিনিট 23 সেকেণ্ড। দিন ও রাত প্রায় আমাদেরই মত।

মঙ্গল-গ্রহের বায়ুস্তর বেশ পাতলা। তাই সূর্যের তাপ ধরে রাখতে পারে না। ফলে দিনের বেলায় যেমন গরম, রাতের বেলায় তেমনি ঠাণ্ডা। অল্প সময়ের ব্যবধানে তাপমাত্রার এত পার্থক্য পৃথিবীর কোন প্রাণীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। তবে মস বা সবুজ শেওলা জাতীয় নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের পক্ষে তা সম্ভব।

পৃথিবীর অক্ষরেখার মত মঙ্গলের অক্ষরেখাও কক্ষতলের উপর লম্বভাবে নেই। একটু হেলে আছে। এজন্য পৃথিবী-গ্রহে ঋতু-পরিবর্তনের মত মঙ্গল-গ্রহেও ঋতু পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞানী হার্শেলের চোখেই সর্বপ্রথম মঙ্গলের এই ঋতু পরিবর্তন ধরা পড়ে।

বর্তমান কালের গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মঙ্গল-গ্রহের আট ভাগের প্রায় পাঁচ ভাগই মরুভূমি। সেখানে জলের সরবরাহ অত্যন্ত কম। উভয় মেরুপ্রদেশ বরফে ঢাকা থাকে। তবে গ্রীষ্মকালে সেই বরফ গলে জলধারা প্রবাহিত হয়। হয়তো তখন সবুজ শেওলা জন্মায়।

মঙ্গল-গ্রহের আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে বিজ্ঞানী-মহলে তেমন কিছু মতভেদ নেই। তবে সেখানে খালের অস্তিত্ব নিয়ে যথেষ্ট মত-পার্থক্য আছে।

ইটালি দেশের বিজ্ঞানী সিয়াপারেলি সবার আগে বললেন যে, মঙ্গল গ্রহে তিনি কতকগুলো লম্বা লম্বা দাগ দেখেছেন। তাঁর মতে এগুলো কৃত্রিম খাল।

আমেরিকার বিজ্ঞানী পিকারিং এই সব খালের পাশে সবুজ অঞ্চল দেখতে পেলেন। তাঁর মতে এই সবুজ অঞ্চল জলপূর্ণ খালগুলির পার্শ্ববর্তী সজীব গাছপালা।

এই খালকে কে খনন করল, কেন করল? এই প্রশ্ন এল বিজ্ঞানীদের মনে। আর এই নিয়ে তাঁরা গবেষণা সুরু করলেন।

1894 সালে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক লাওয়েল বললেন যে, এসব খাল মরু-অঞ্চল থেকে কেটে আনা হয়েছে। নইলে এমন সুশৃঙ্খল ভাবে জ্যামিতির ছকে সাজানো কেন? আসলে কৃষি-কাজের সুবিধার জন্যই এই সব খাল কাটা হয়েছে। এগুলো কৃত্রিম খাল।

কৃত্রিম খাল স্বীকার করলেই স্বীকার করতে হয়—মঙ্গল-গ্রহে সূক্ষ্ম বুদ্ধির জীব নিশ্চয়ই আছে। নইলে এসব খাল কাটলো কে?

আরো একদল বৈজ্ঞানিক এই খালগুলি সম্পর্কে বললেন—মঙ্গল গ্রহে খালের কোন চিহ্নই নেই। আসলে যাঁরা সেখানে খাল দেখেছেন তাঁদের দৃষ্টি-বিভ্রম—শুধু মনের কল্পনা। খালই যখন নেই তখন কে খাল কাটল সে প্রশ্নও নেই।

কিন্তু সুদীর্ঘ কালের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে সবাই এখন স্বীকার করেছেন যে, মঙ্গল-গ্রহের দেহে কতকগুলি দাগ আছে। এই দাগগুলি খাল বা অন্য কিছু এবং খাল হলে কৃত্রিম না অকৃত্রিম তা আজো কেউ স্পষ্ট ক'রে বলতে পারেন নি। এ সম্পর্কে এখনো জল্পনা-কল্পনার বিরাম নেই।

মঙ্গল-গ্রহে জীব বাস করার প্রধান অন্তরায় সেখানে অক্সিজেন নেই বললেই চলে। হয়তো আগে প্রচুর অক্সিজেন ছিল। এখন অক্সাইডে পরিণত হয়েছে।

মঙ্গল-গ্রহ সম্পর্কে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীদের ধারণা:

পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গল আরো অনেক দূরে থাকায় পৃথিবী থেকে অনেক বেশী এগিয়ে গেছে। আজ থেকে বহুযুগ আগেই মঙ্গল গ্রহ জীবের বাসোপযোগী ছিল। হয়তো উন্নত ধরণের জীব সেখানে

সভ্যতার চরমসীমায় পৌঁছেছিল। তাই বুঝি জলসেচের জন্যই ওই সব কৃত্রিম খালগুলি অতীত দিনের চিহ্ন বহন করছে। তারপর হাজার হাজার বছর পরে স্বাভাবিক নিয়মেই ধীরে ধীরে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হল সজীব-সমৃদ্ধ মঙ্গল-গ্রহ।

পৃথিবীর একটি চাঁদের মত মঙ্গলের চাঁদ আছে দুটি। এরা আবিষ্কৃত হয় 1877 সালে। প্রাচীন রোমানদের যুদ্ধ দেবতার নাম অনুসারে মঙ্গল-গ্রহের ইংরেজী নাম রাখা হয়েছে—মার্স (Mars)। আর এই মার্স দেবতার অনুচরদ্বয়ের নাম অনুসারে মঙ্গলের চাঁদের নাম—ফোবস্ ও ডাইমস।

গ্রহাণুপুঞ্জ

অনেক গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে। আবিষ্কার হয়েছে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বেশ একটু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে এত বেশী ফাঁক কেন? 56 কোটি কিলোমিটার ব্যবধানে ও বেশী পর পর আর কোন দু'টো গ্রহের মাঝে এতো বেশী ফাঁক নেই। এই শূন্য পথে আর কোন গ্রহ যাতায়াত করছে না তো!

সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কেপলার এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানী জ্যোতির্বিদ জোহান এলার্ট দৃঢ়তার সঙ্গে কেপলারের সন্দেহ সমর্থন করলেন।

তাহলে নিশ্চয়ই মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানে আরো একটি গ্রহ আছে। অনুসন্ধান চলতে লাগলো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের।

1801 সালের পয়লা জানুয়ারী সবার সব চিন্তার নিরসন ক'রে ছোট একটি গ্রহ ধরা দিলো সিসিলির মানমন্দিরের পরিচালক পিয়াজির দূরবীণে। তিনি গ্রহটির নাম দিলেন—'সেরেজ'। সেরেজ হল সিসিলির দেবতার নাম।

সেরেজের মতো এতো ছোট গ্রহ এর আগে আর আবিষ্কার হয়নি। ওর ব্যাস মাত্র 800 কিলোমিটার। আয়তন আমাদের

চাঁদের আশি ভাগের এক ভাগ ; আর পৃথিবীর আয়তন থেকে চার হাজারগুণ ছোট।

ছোট গ্রহদের ভেতর সব থেকে ছোট, যেন ছোট 'গ্রহের ভিড়ে খুদকণা'। তবুও তো মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝেকার বিরাট ফাঁকা জায়গার ভেতর একটা গ্রহ আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ! বছর খানেক বাদে আরো একটা খুদে গ্রহ আবিষ্কৃত হলো ওই সেরেজের কাছাকাছি জায়গায়। একটা গ্রহের এতো কাছে আর কোন গ্রহ তো থাকতে পারে না। তখন চিন্তায় পড়লেন বিস্মিত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। যাহোক, যখন রয়েছে তখন তার একটি নাম দিতে হবে বৈকি ! তাই দ্বিতীয় খুদে গ্রহটির নাম দেওয়া হলো 'প্যালাস', গ্রীকদের যিনি সরস্বতী। 1802 সালের মার্চ মাসে একে খুঁজে পেয়েছিলেন জ্যোতির্বিদ্ ওলবার্স।

কিন্তু বিজ্ঞানীদের বিস্ময় এখানেই শেষ হলো না। বরং সে বিস্ময় আরো বাড়িয়ে দিলো 1804 সালে এবং 1807 সালে পর পর আরো দুটি খুদে গ্রহের আবিষ্কারের ফলে। তৃতীয়টির নাম হলো 'জুনো', আর চতুর্থটির 'ভেস্তা'।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চিন্তার বড় একটা খোরাক পেলেন। যেখানে একটা গ্রহ থাকার কথা, সেখানে চার চারটে খুদে গ্রহ ! ব্যাপারটা ভালো লাগুক বা মন্দ লাগুক একটা বড় গ্রহই যে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছে, এতো আর অবিশ্বাস করা যায় না ! হয়তো কোনকালে মহাশূন্যে দারুণ এক দুর্বিপাক ঘটে থাকবে। আর সম্ভবত ঘটে থাকবে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝামাঝি কোথাও, যার ফলে বড় একটা গ্রহ ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে।

দেখা গেলো সেরেজ থেকে প্যালাস জুনো ও ভেস্তা অনেক ছোট। প্যালাসের ব্যাস প্রায় 500 কিলোমিটার, ভেস্তার 400, আর জুনোর মাত্র 200। ভেস্তার আবিষ্কারের পর অনেক দিন বেশ চুপচাপ। তারপর 1830 সালে আরো ছোট আর একটি গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেল। এর নাম দেওয়া হলো

'অ্যাসট্রিয়া'। প্রুসিয়ার একজন শৌখীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যাসট্রিয়ার আবিষ্কারকর্তা।

এখন থেকে শৌখীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজ হলো টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে ধৈর্য সহকারে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা—সৌভাগ্য ক্রমে যদি পাত্তা পাওয়া যায় কোন খুদে গ্রহের।

কিন্তু সত্যই সৌভাগ্য ছিলো কয়েকজন শৌখীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর। তাঁরা অনেকগুলি খুদে গ্রহ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। দেখা গেল এই খুদে গ্রহগুলো সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে প্রায় ডজন খানেক। এমন কি ওই সব খুদে গ্রহদের নাম দেওয়ার জন্য রোমান দেব-দেবীদের নাম সব ফুরিয়ে গেছে। তাই ফিনিস, জর্মান ও নরওয়ে দেশের দেব-দেবীর নাম থেকে গ্রহদের নাম দেওয়া হলো। তবু ওতেও কুলালো না। কেননা ইতিমধ্যে আরো অনেক খুদে গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে। সোভিয়েত দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও অনেক খুদে গ্রহকে খুঁজে বের করলেন এবং এক একটার নাম দিলেন—ভাদিলেন, মরোজভিয়া, পাভলভিয়া প্রভৃতি।

1950 সাল পর্যন্ত দেড়হাজারের বেশী খুদে গ্রহের পাত্তা পাওয়া গেছে। এক একটি 20 থেকে 100 কিলোমিটার ব্যাস-এর। এমনকি এমন খুদে গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে যার ব্যাস মাত্র এক কিলোমিটার। এই খুদে গ্রহের উপরিভাগের আয়তন মাত্র 300 হেক্টর।

মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে খুব কাছাকাছি জায়গায় খুদে এবং অতি খুদে সব রকম গ্রহ আছে বলেই জ্যোতির্বিজ্ঞান বিশারদ্‌দের বিশ্বাস। এককালে মহাশূন্যে সত্যই এক বিপর্যয় ঘটেছিল। ফলে একটি বড় গ্রহ ভেঙে চৌচির হয় এবং খুদে আর অতি খুদে গ্রহে পরিণত হয়। এই সব খুদে গ্রহদের এক একটির নাম গ্রহিকা; সমবেত নাম—গ্রহাণুপুঞ্জ।

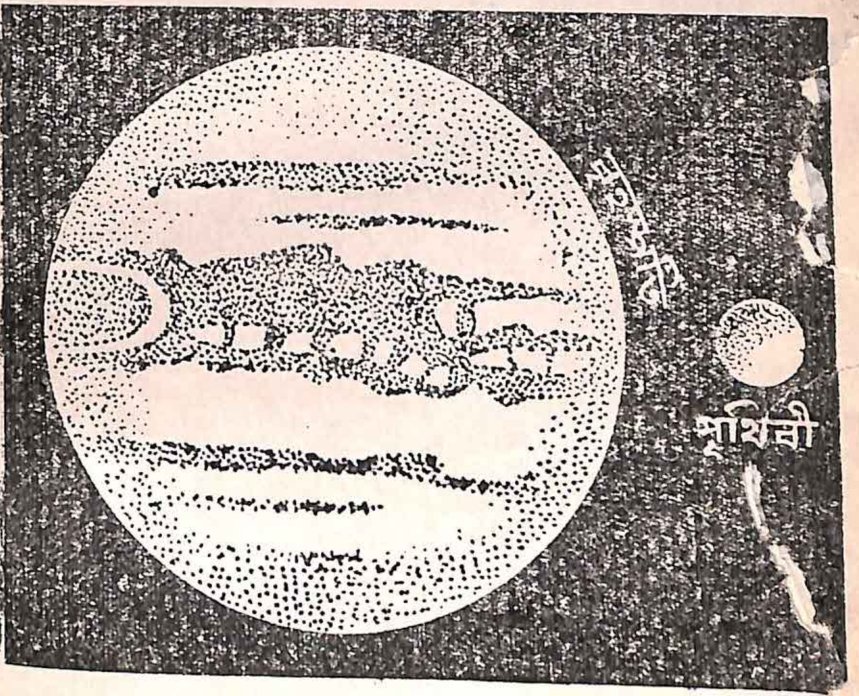
বৃহস্পতি গ্রহ

গ্রহের মধ্যে বৃহস্পতি আয়তনে সবচেয়ে বড়। এজন্যই একে গ্রহদের রাজা বা 'গ্রহরাজ' বলে। রোমানরাও ভেবে চিন্তে এর নাম দিয়েছিলেন 'জুপিটার' যিনি রোমান দেবতাদের অধিপতি।

গ্রহরাজের আয়তন বোঝবার জন্য কয়েকটা তথ্য দেই :

কেউ যদি প্রতিদিন 50 কিলোমিটার গতিতে পৃথিবী পরিক্রমণে বের হয় তাহলে এক চক্কর দিতে সময় লাগবে 800 দিন। কিন্তু বৃহস্পতিকে এক চক্কর দিতে সময় লাগবে 25 বছর।

এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং কুমেরু—এই সাতটি মহাদেশ নিয়ে গোটা পৃথিবী। কিন্তু ওই



পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় বৃহস্পতির আয়তন

রকম সাতশোটি মহাদেশ লাগবে বৃহস্পতির সমান হতে। আসলে 1300 পৃথিবী মিলে একটি বৃহস্পতি-গ্রহ।

গ্রহরাজ পৃথিবীর তুলনায় তেরশ' গুণ বেশী হলেও ওর ভর কিন্তু খুব বেশী নয় ; পৃথিবীর ভর থেকে মাত্র তিনশ' সতের গুণ বেশী। বৃহস্পতির ব্যাস হলো ৪৪,700 মাইল বা 143064.5 কিলোমিটার। বৃহস্পতির মহাকর্ষ পৃথিবীর চাইতে অনেক বেশী। পৃথিবীতে 60 কিলোগ্রাম ওজনের মানুষ বৃহস্পতি গ্রহে গিয়ে পড়লে 140 কিলোগ্রাম হবে।

এক বছরে পৃথিবী একবার সূর্যের চারপাশ দিয়ে ঘুরে আসে। কিন্তু এই একবার ঘুরতে বৃহস্পতির সময় লাগে প্রায় বার পৃথিবী-বছর। একেতো পৃথিবীর তুলনায় বৃহস্পতিকে অনেক বেশী পথ ঘুরতে হয়, তার উপর আয়তনের জন্য ওর গতিও অনেক কম। পৃথিবীর গতি যেখানে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় উনিশ মাইল, বৃহস্পতির গতি সেখানে প্রতি সেকেণ্ডে আট মাইল বা তের কিলোমিটার। তবে পৃথিবী যখন চব্বিশ ঘণ্টায় (23 ঘঃ 56মিঃ 4 সেঃ) নিজের চারদিকে একবার ঘুরে, বৃহস্পতি তখন মাত্র দশ ঘণ্টায় (9ঘঃ 56 মিঃ 41সেঃ) একবার ঘুরপাক খায়। আরো একটা কথা, পৃথিবীর অক্ষরেখা বা মেরুদণ্ড কক্ষপথের সঙ্গে বেশ একটু হেলান অবস্থায় আছে এবং যার জন্য পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয়। কিন্তু বৃহস্পতির অক্ষরেখা বা মেরুদণ্ড কক্ষপথের উপর প্রায় সোজা হয়ে আছে। সেজন্য বৃহস্পতি গ্রহে কোন ঋতু পরিবর্তন হয় না। সেখানে দিন-রাত প্রায় সমান সমান—পাঁচ ঘণ্টা দিন, পাঁচ ঘণ্টা রাত।

পৃথিবীর চাঁদের মত বৃহস্পতির বারটি চাঁদ আছে। সব শেষেরটি আবিষ্কৃত হয়েছে 1951 খৃষ্টাব্দে। এদের মধ্যে চারটি বেশ বড়, বুধ গ্রহের আয়তনের দ্বিগুণ। বাকী আটটি খুব ছোট।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা—এতগুলো চাঁদের জ্যোৎস্না দেখবার মত প্রাণী বোধ হয় বৃহস্পতিতে নেই। কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করতেন, বৃহস্পতির দেহ জমাট বেঁধে পৃথিবীর উপরিভাগের মত কঠিন হয়নি ; তরল অথবা বায়বীয় অবস্থায় আছে।

তাঁদের এই অনুমানের অবশ্য একটা যুক্তিও ছিল। পৃথিবী থেকে বৃহস্পতির বিরাট দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও বৃহস্পতিকে খুব উজ্জ্বল দেখায়। তাই তাঁরা অনুমান ক'রে বললেন—নিশ্চয়ই বৃহস্পতির নিজস্ব কিছু আলো আছে। আর একথা যদি সত্যি হয়, তবে বৃহস্পতিকে বায়বীয় অবস্থায় থাকতে হবে।

কিন্তু পরের যুগের পণ্ডিতগণ প্রমাণ ক'রে দেখলেন—না, একথা সত্যি নয়। বৃহস্পতির নিজস্ব কোন আলো নেই। কারণ বৃহস্পতির ছায়ার মধ্যে তার চাঁদগুলো যখন পড়ে, তখন তো তাদের দেখা যায় না। বৃহস্পতির নিজস্ব আলো থাকলে নিশ্চয়ই তাদের দেখা যেতো—এযুক্তি অস্বীকার করা যায় না। তবু প্রশ্ন থেকে যায়—বৃহস্পতিকে এত উজ্জ্বল দেখায় কেন? এর উত্তরও অবশ্য তাঁরাই দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন—বৃহস্পতির দেহ অত্যন্ত মসৃণ। ফলে সূর্যের যেটুকু আলো বৃহস্পতির দেহে পড়ে, তার সবটুকুই প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীর দিকে ফিরে আসে। এজন্যই পৃথিবীর লোক বৃহস্পতিকে এত উজ্জ্বল দেখে।

বৃহস্পতির উপরিভাগ কঠিন আবরণের হলেও প্রাণীবাসের অন্য অন্তরায় আছে। তা হচ্ছে—তাপের অভাব। যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বরফ গ'লে জল হয়, বৃহস্পতির দেহের তাপমাত্রা তা থেকেও 140 ডিগ্রী কম। এত ঠাণ্ডায় বৃহস্পতির উপরিভাগের কোন জিনিসই তরল অবস্থায় থাকতে পারে না। সব কিছুই জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে থাকবে। অবশ্য এ-সবই বিজ্ঞানীদের অনুমান মাত্র। তাঁরা আরো অনুমান করেন—বৃহস্পতির কঠিন আবরণের উপরে আছে বায়ুর স্তর। আর এই বায়ু-স্তরে মেঘ ভেসে বেড়ায়।

মেঘগুলো কি দিয়ে তৈরি এবং বায়ুরই-বা উপাদান কি—সে-নিয়ে এখনও বিজ্ঞানী মহলে গবেষণা চলছে। কেউ কেউ বলেন—পৃথিবীর বায়ুর মত বৃহস্পতির বায়ুতেও অক্সিজেন আছে। আরো আছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, আরগন, নিয়ন প্রভৃতি গ্যাস-জাতীয়-বস্তু। তবে এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

বৃহস্পতি সম্পর্কে এখনও অনেক জিনিস জানবার বাকী আছে। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিনে খুব শিগ্গির আরো কিছু জানবার আমরা আশা করি।

সেই সুদূর অতীত থেকেই আমাদের দেশের পণ্ডিতগণও বৃহস্পতি সম্পর্কে অনেক খোঁজ-খবর রেখেছেন। ভারতীয় শাস্ত্রে বৃহস্পতি হচ্ছে—দেবতাদের গুরু এবং জ্ঞানে-গুণে ও বিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয়। বিজ্ঞান হয়তো একদিন প্রমাণ করবে গ্রহদের মধ্যে বৃহস্পতি এত গুণের অধিকারী কেন।

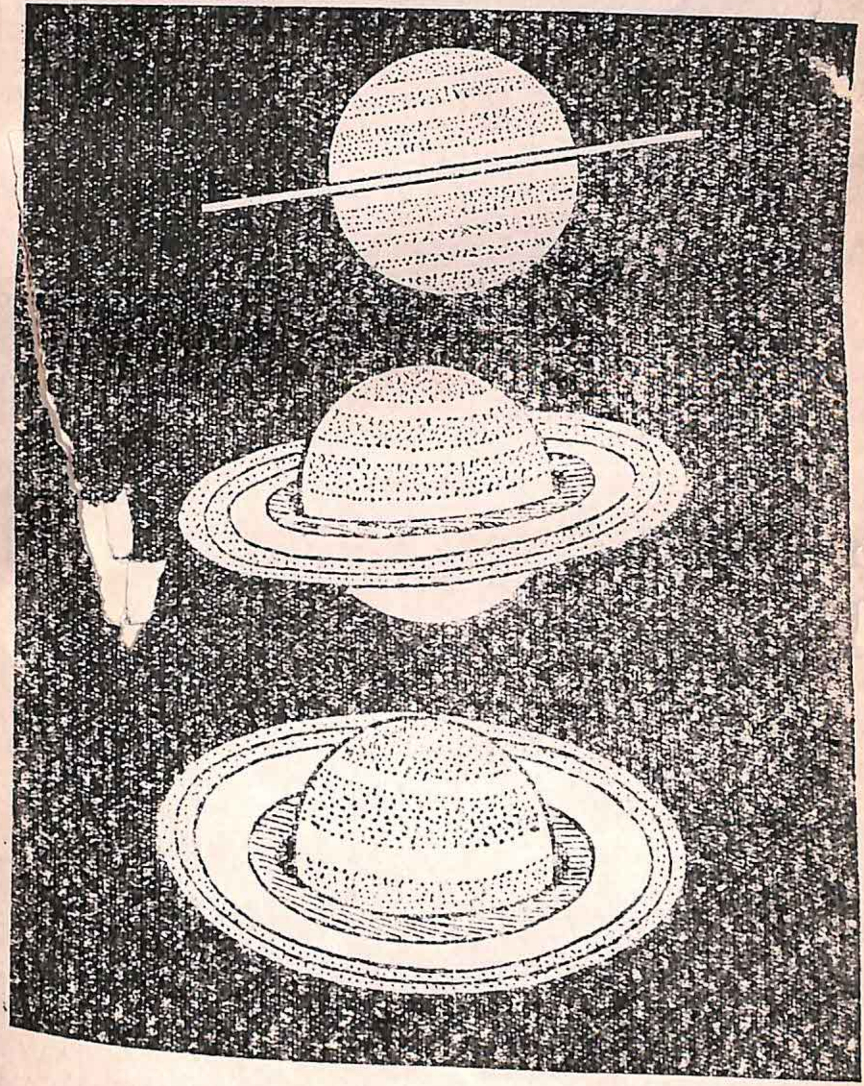
শনি গ্রহ

যে শাস্ত্রে বৃহস্পতিকে অধিপতি বলে সম্মান দেওয়া হয়েছে, সেই শাস্ত্রেই উল্লেখ আছে—শনি হচ্ছে অমঙ্গল বা অশুভ কাজের প্রতীক। তাই কথায় কথায় আমরা বলি—শনির দৃষ্টি পড়েছে ওর ওপর। কিন্তু শনির যে কেন এই অপবাদ তার উল্লেখ নেই কোথাও। আর পাঁচটা গ্রহের মত শনিও একটি গ্রহ মাত্র। তবে আকৃতিতে এর একটু বৈশিষ্ট্য আছে, এই যা। শুধু এজন্যই কি শনির এই অপবাদ?

আয়তনে বৃহস্পতির পরেই শনির স্থান। শনি দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। এর আয়তন 750টি পৃথিবীর আয়তনের সমান। বৃহস্পতির মত শনির দেহও খুব হাল্কা। তাই ওর ভর পৃথিবীর ভরের 95 গুণ মাত্র। তাছাড়া, দেহের উপরিভাগের তাপমাত্রা বৃহস্পতির থেকেও 10 ডিগ্রী কম। জল জ'মে বরফ হতে যত ডিগ্রী তাপের প্রয়োজন, শনির দেহের তাপমাত্রা তার থেকেও 150 ডিগ্রী কম। বৃহস্পতির মত শনির দেহের কঠিন আবরণের উপরে বায়ুর স্তর আছে। শনি থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় 150 কোটি কিলোমিটার।

প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় আপন মেরুদণ্ডের চারদিকে পৃথিবী এক পাক খা[য়]। কিন্তু শনি পাক খায় মাত্র দশ ঘণ্টায় (10 ঘঃ 14 মিঃ)। [আ]বা[র] সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় হিসেবে শনির সময় লাগে প্রায় তিরিশ পৃথিবী-বছর।

শনি নটি চাঁদের অধিকারী। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় চাঁদটির নাম—টাইটন; আর সব চেয়ে কাছে আছে তার নাম—মাইমস। টাইটনের আয়তন আমাদের ছ'টি চাঁদের সমান।



পৃথিবী থেকে দেখা শনির বিভিন্ন অবস্থান

অন্য গ্রহ থেকে শনির একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তা হচ্ছে—শনির বলয়। চাকার মত তিনটি বলয় শনিকে

ঘিরে শনির চারপাশেই ঘুরছে। এই বলয়গুলির সঙ্গে শনির দেহের কোন যোগাযোগ নেই। শনির এই অদ্ভুত আকৃতির জন্যই দেখতে এত অপূর্ব।

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌রা প্রাচীনকাল থেকেই শনির কথা জানতেন; কিন্তু তার বলয়ের খবর রাখতেন কিনা ঠিক বলা যায় না। 1610 খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও সবার আগে শনির বলয়ের কথা বলেন। তাঁর ছোট্ট একটি দূরবীন দিয়ে আকাশের গায়ে তিনি দেখলেন—শনির ছু'পাশে চাকতির মত কি যেন জ্বল্ জ্বল্ করছে। কিন্তু কয়েক মাস পর তিনি এদের আর দেখতে পেলেন না। তিনি তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য আবার তিনি দেখেছিলেন। তবে তাদের এই হারিয়ে যাওয়ার কারণ খুঁজে পান নি।

খুঁজে পেলেন তাঁর পরবর্তী যুগে বৈজ্ঞানিক হাইগেন্স। অবশ্য হাইগেন্সের আমলে দূরবীন যন্ত্রের আরো উন্নতি হয়েছিল। উন্নত ধরনের দূরবীন দিয়ে গবেষণা ক'রে হাইগেন্স বললেন—বলয় ছু'টি নয়, তিনটি। আর চাঁদার মত এদের 'কলা'র জন্যই গ্যালিলিওর চোখে এরা একবার হারিয়ে গিয়েছিলো। এদের কলার জন্য কখনও এরা একটি সরু সরলরেখার মত দেখায়, কখনো দেখায় আংটির মত; কখনও-বা চাকার মত গোল। গ্যালিলিওর কাছে যখন এরা হারিয়ে গিয়েছিলো, তখন বোধহয় রেখার মত সরু হয়েছিল। তাই তাঁর ছোট্ট দূরবীনে ধরা পড়েনি।

বিজ্ঞানী লাপ্লাস বললেন—বলয় তিনটি এক সময় শনির দেহেরই অংশ ছিল। এখন উপগ্রহের আগের অবস্থা। তাঁর ধারণা—এরা এক সময় জমাট বেঁধে আরও তিনটি চাঁদে পরিণত হবে।

বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল কিন্তু এ মতের বিরোধী। তিনি বলেন—শনির বলয়গুলো কখনও চাঁদের মত উপগ্রহে পরিণত হতে পারে না।

বিজ্ঞানী রশ্ প্রমাণ করতে চাইলেন যে, লাপ্লাস যা

বলেছেন তার উল্টোটাই সত্যি। তার মানে বলয় তিনটি কোনদিনই চাঁদে পরিণত হবে না বরং একটি চাঁদ থেকেই ওই তিনটি বলয়ের উৎপত্তি হয়েছে। এক সময় তিনটি বলয় নিয়েই শনির একটি চাঁদ ছিল।

শুনে অবাক হতে হয়, জ্যোতিষী জেফ্রেল বলেছেন—আমাদের পৃথিবীর চাঁদও এক সময় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে বলয়ের মত হবে। তখন ভারী মজা হবে! আমরা এই পৃথিবীতে ব'সে দেখবো– শনির মত পৃথিবীর চারপাশে বলয় ঘুরছে।

কিন্তু একটা কথা ভাবতে হবে তখন আর চাঁদ থাকবে না! চাঁদের সৌন্দর্য আমাদের হারাতে হবে। নাইবা থাকলো চাঁদের সৌন্দর্য, একটা নতুন জিনিস পাবো।

আচ্ছা, কে কে আমরা চাঁদ দেখতে চাই; আর কে কে দেখতে চাই পৃথিবীর বলয়?

না, থাক। ব'লে কাজ নেই। বলয় দেখবার সৌভাগ্য অথবা চাঁদ না-দেখার দুর্ভাগ্য কোনটাই আমাদের পোহাতে হবে না। যদি কোনদিন আমাদের এই চাঁদ বলয়ে পরিণত হয় তবে সে অন্তত পাঁচ হাজার কোটি বছর আগে নয়। আপাতত: নিশ্চিন্ত মনে চাঁদের সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করি।

ইউরেনাস গ্রহ

আজ থেকে 180 বছর আগে জার্মান দেশের এক সঙ্গীত-শিক্ষক ইংলণ্ডের এক ধর্মমন্দিরে অর্গান বাজাতেন। গরীব বাবার গরীব ছেলে তিনি। পয়সার অভাবে স্কুলে যেতে পারেন নি। তাই অল্প বয়সেই ভর্তি হয়েছিলেন সৈন্যদলে। কিন্তু সৈন্য বিভাগের কঠোরতা তাঁর ভাল লাগলো না। তিনি সেখান থেকে পালিয়ে স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে লুকিয়ে থাকলেন এবং তখন থেকেই সুরু হলো তাঁর সঙ্গীত আরাধনা এবং অধ্যাপনা। কিন্তু সঙ্গীতের মূর্ছনা তাঁকে বেঁধে রাখতে পারলো না। তিনি গণিত শাস্ত্রের প্রতি

আকৃষ্ট হলেন এবং সুরু করলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা। খালি চোখে কতটুকুই-বা আকাশের খবর পাওয়া যায়। তাই আপন হাতেই দূরবীন গড়তে লাগলেন। তারপর অধ্যবসায় আর ধৈর্যের সঙ্গে আপন হাতে-গড়া দূরবীন চোখে দিয়ে তিনি সারারাত আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন।

একদিন তাঁর সাধনার সিদ্ধি হলো। তিনি দেখতে পেলেন একটি নতুন তারা। সেদিন ছিলো 1781 খৃষ্টাব্দের 13ই মার্চ। আরো আরাধনা ক'রে তিনি বুঝলেন, এটি কোন তারা নয়, একটি গ্রহ যা এর আগে কোনদিন আর কারো চোখে ধরা পড়ে নি। গরীব সঙ্গীত শিক্ষকের এই আবিষ্কারের কথা প্রথমে কেউ বিশ্বাসই করলেন না। কিন্তু সত্য বেশী দিন চাপা থাকে না। সবাইকে একদিন স্বীকার করতে হলো—সঙ্গীত শিক্ষক শুধু ধর্মমন্দিরের শিক্ষকই নন, তিনি ধর্মমন্দিরের জ্যোতির্বিদ্—তিনি নতুন গ্রহের আবিষ্কারক। তিনিই স্যর উইলিয়ম হর্শেল।

ইংলণ্ডের রাজা খবর পেয়ে আনন্দে অধীর হলেন। তাঁর রাজত্ব-কালে নতুন গ্রহের আবিষ্কার—একি তাঁর কম সৌভাগ্যের কথা! তিনি সাদরে আহ্বান করলেন হর্শেলকে। তাঁকে রাজ-জ্যোতিষী রূপে বরণ করলেন। প্রতিদানে হর্শেলও তাঁর আবিষ্কৃত গ্রহের নাম রাখলেন রাজা জর্জের নামে—'জর্জ-তারা'।

পরবর্তী কালে এই 'জর্জ-তারা'ই গ্রীক দেবতার নাম-অনুসারে 'ইউরেনাস' নামে পরিচিত হলো। একে অনেকে 'হর্শেল'-ও বলেন। ইউরেনাসের ভারতীয় নাম 'ইন্দ্রগ্রহ' অথবা 'বারুণী'। এ নাম দেওয়া হয়েছে অনেক পরে। কারণ, প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ সম্ভবত ইউরেনাসের কথা জানতেন না। তাঁরা জানলে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে নিশ্চয়ই এর উল্লেখ থাকতো। অবশ্য এই না-জানার হেতুও আছে। খালি চোখে ইউরেনাসকে দেখা যায় না। প্রাচীনকালে তো আর দূরবীন ছিলো না। ইউরেনাসই দূরবীন দিয়ে আবিষ্কার করা প্রথম গ্রহ। এই আবিষ্কারের সব কৃতিত্বই একা হর্শেলের।

শুধু ইউরেনাসই নয়, শনি গ্রহের দু'টি উপগ্রহও হর্শেল সাহেব আবিষ্কার করেন। তাছাড়া ইউরেনাসের পাঁচটি চাঁদের মধ্যেও দু'টির আবিষ্কারক বিজ্ঞানী হর্শেল।

ইউরেনাস আয়তন 64টি পৃথিবীর আয়তনের সমান ; আর ওজন পৃথিবীর প্রায় পনের গুণ। ইউরেনাসের ব্যাস 32000 মাইল বা 51613 কিলোমিটার। 10 ঘণ্টা 45 মিনিটে ইউরেনাস-এর এক দিন হয়। অবশ্য পৃথিবীর সময় অনুযায়ী।

সূর্য থেকে ইউরেনাসের দূরত্ব 17830 লক্ষ মাইল বা 28758 লক্ষ কিলোমিটার। এর গতি প্রতি সেকেণ্ডে 4·2 মাইল বা 6·8 কিলোমিটার। এজন্য আমাদের চুরাশী বছরে ইউরেনাসের একটি বছর। আমাদের দেশের অনেকের এক জন্ম শেষ হলেও ইউরেনাসের এক বছর শেষ হয় না। কিন্তু বুড়ো হয়ে বাঁচবার মত সেখানে কেউ নেই। কারণ ইউরেনাসের দেহের অবস্থা শনি এবং বৃহস্পতির মত হিম-শীতল বরফ থেকেও ঠাণ্ডা।

ইউরেনাসের নিরক্ষরেখা কক্ষতলের সঙ্গে প্রায় সমকোণ তৈরী করেছে। তাই এখানে ঋতুপরিবর্তন হয়। আরো একটি মজার কথা—পৃথিবীর পরিক্রমণ এবং পরিভ্রমণ দুটোই এক মুখী এবং বামাবর্তী। কিন্তু ইউরেনাসের পরিক্রমণ ও পরিভ্রমণ পরস্পর বিপরীত মুখী।

নেপচুন গ্রহ

অনেকেই ভাগ্যে বিশ্বাস ক'রে থাকেন। বিজ্ঞানের বই-এ ভাগ্যের কথা উল্লেখ করছি ব'লে অনেকেই হয়তো মনে মনে হাসবে। কিন্তু 'নেপচুন-গ্রহ' আবিষ্কারের ব্যাপারে কিভাবে ভাগ্যের খেলা চলেছিলো সে-কথাই এখন বলছি:

হর্শেলের ইউরেনাস আবিষ্কারের পর আর কোন গ্রহের সন্ধান তিনি পাননি। বেশ কিছুদিন কেটে গেল। হর্শেল আবিষ্কার করলেন ইউরেনাসের দু'টি উপগ্রহ। তিনি আরো সন্ধান করতে

লাগলেন। না, আকাশের গায়ে আর কোথাও কোন গ্রহের সন্ধান পেলেন না। তবে তিনি নিপুণ দূরবীন দিয়ে ইউরেনাসের গতি-বিধি সম্পর্কে তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজ করলেন এবং তাঁর গণনার ফলাফল লিপিবদ্ধ করলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই দেখা গেল, তাঁর গণনায় কোথায় যেন কি ভুল হয়ে গেছে। নইলে যে-সময়ে এবং যেখানে ইউরেনাসকে দেখবার কথা, সে-সময়ে এবং সেখানে তাকে দেখা যায় না কেন? বিজ্ঞানী মহলে এ নিয়ে সাড়া পড়ে গেল। হর্শেলের গণনার ভুল ধরবার জন্য সবাই তখন ব্যস্ত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে বা কিছু পরে ইউরেনাস আবার দেখা দিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে জ্যোতির্বিদ্‌দের অবাক করলো।

আকাশের গায়ে ইউরেনাসের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের যখন এ রকম একটা লুকোচুরি খেলা চলছিলো, তখন আডামস্ নামে এক ইংরেজ তরুণ লুকোচুরির রহস্য ভেদ করবার জন্য ক্যামব্রিজের এক কলেজে গবেষণা সুরু ক'রে দিলেন।

আশ্চর্যের কথা, ঠিক একই সময়ে এবং একই উদ্দেশ্য নিয়ে ফরাসী দেশের আর এক তরুণ ইউরেনাসের গতি-বিধির কেন পরিবর্তন হচ্ছে তার সন্ধান সুরু করে দিয়েছেন। সেই যুবকের নাম লেভেরিয়ে।

ইংলিশ চ্যানেলের এপারে আর ওপারে দু'জন যুবক একই সময়ে একই কাজ ক'রে চলেছেন। অথচ কেউ কারো কথা জানেন না। কিন্তু একেই আমি ভাগ্যের কথা বলছি না। ভাগ্যের খেলা হলো আরো পরে।

আডামস্ অনুমান করলেন—ইউরেনাসের গতিবিধি পরিবর্তনের মূল কারণ, অজ্ঞাত কোন গ্রহের অবস্থিতি। তিনি অঙ্ক ক'ষে এই অজ্ঞাত গ্রহ সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করলেন। এবং তা যাচাই করবার জন্য মানমন্দিরের অধ্যক্ষ চ্যালিস সাহেবের হাত দিয়ে রাজ-জ্যোতিষীর কাছে পাঠালেন। দুর্ভাগ্যের কথা, রাজ-জ্যোতিষী

আডামস্-এর হিসেবের কাগজ পড়েও একবার দেখলেন না। চাপা পড়ে রইলো অন্য কাগজের তলায়। ভাবলেন, অবসর সময়ে দেখবেন। কিন্তু তিনি জানলেন না, তাঁর এই অবহেলার জন্য একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কারের সম্মান থেকে আডামস্ বঞ্চিত হলেন।

ওদিকে প্রায় ন'মাস পরে ইউরেনাস সম্পর্কে লেভেরিয়েরের সংগৃহীত তথ্য জার্মানির প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ডক্টর গালে পড়লেন এবং তিনি নিজের দূরবীন দিয়ে লেভেরিয়েরের নির্দেশমত অপরিচিত একটি গ্রহের সন্ধান পেলেন। সেদিন ছিল 1846 সালের 23শে সেপ্টেম্বর। আর এই নতুন গ্রহটির নাম দেওয়া হলো নেপচুন, রোমক সমুদ্রের দেবতা যিনি।

নেপচুনের কথা যখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো তখন খেয়াল হলো ইংলণ্ডের রাজ-জ্যোতিষীর। তিনি আডামস্-এর কাগজে দেখলেন—নেপচুন সম্পর্কে যে তথ্য আজ প্রকাশ পেয়েছে তার সব কিছুই আডামস্ লিপিবদ্ধ করেছেন অনেক আগেই। তিনি হায় হায় করতে লাগলেন। তাঁর জন্যই ব্যর্থ হলো আডামসের পরিশ্রম; জয়ের মালা হাতে পেয়েও গলায় পরতে পেলেন না। আবিষ্কারের গৌরব থেকে বঞ্চিত হলো ইংলণ্ড। আডামস্-এর দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলবো!

এই প্রসঙ্গে আরো একজন হতভাগ্য জ্যোতির্বিদের কথা বলতে হয়। আডামস্ এবং লেভেরিয়েরের গবেষণার আরো পঞ্চাশ বছর আগে বার্লিনের এক অখ্যাত জ্যোতির্বিদ জন ল্যালেন্ডি নেপচুন গ্রহটিকে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি কোন গবেষণা করেন নি বা তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রকাশও করেন নি। তাই সভ্য জগতের কাছে কোন পরিচয় ছিল না তাঁর। তিনি অপরিচিতই রয়ে গেলেন। জন ফ্লামষ্টেডও হর্শেলের অনেক আগেই ইউরেনাসকে দেখেছিলেন।

পৃথিবী থেকে বহুদূরে রয়েচে নেপচুন। এত দূরে যে খুব

শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে ভাল ক'রে দেখা যায় না। আয়তনে নেপচুন পৃথিবীর 78 গুণ বড়। ওর ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় সাড়ে সতের গুণ। আকারে বড় হলেও ওজন তেমন বেশী নয়। কারণ নেপচুনের দেহ এখনও হাল্কা বাষ্পে পূর্ণ আছে।

নেপচুনের ব্যাস হলো 31000 মাইল বা 50,000 কিলোমিটার। আর সূর্য থেকে নেপচুনের গড় দূরত্ব হল 27,9300 লক্ষ মাইল বা 44,967 লক্ষ কিলোমিটার। নেপচুনের দেহের উষ্ণতা এত বেশী যে সেখানে কোন জীব এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারে না। তবে সূর্য থেকে আগত তাপ এই উষ্ণতার হেতু নয়। সূর্য থেকে যে তাপ এবং আলো আমরা পাই তার ন'শ ভাগের এক ভাগ পায় নেপচুন। নেশচুনের দিনের আলো রাতের পৃথিবীর জ্যোৎস্নার মত। নেপচুনের গতি ইউরেনাসের থেকেও কম। প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র সাড়ে তিন মাইল অথবা সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার। এজন্য নেপচুনের বছর পৃথিবীর প্রায় 165 বছরের মত, আর প্রায় 16 ঘণ্টায় একটি দিন। আবিষ্কারের দিন থেকে হিসেব করলে দেখা যায়, নেপচুন এখনও সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পারেনি। নেপচুন সম্পর্কে এখনও অনেক তথ্য অজানা রয়েছে।

নেপচুনের দু'টি চাঁদ আছে এবং তার একটির আয়তন বুধের মত। আর একটি অত্যন্ত ছোট, আবিষ্কার হয়েছে 1949 সালে; আবিষ্কারক বিজ্ঞানী কেপলার।

প্লুটো গ্রহ

1930 সালের 13ই মার্চ মহাশূন্যের ইতিহাসে একটা নতুন তথ্য লিপিবদ্ধ হল। বিজ্ঞানী টমবাউ একটা খবর ঘোষণা করলেন। ঘোষণা করলেন—একটা নতুন গ্রহ আবিষ্কারের কথা। কিন্তু এই আবিষ্কারের পিছনে বিজ্ঞানী পার্সিভ্যাল লাওয়েল-এর অবদান কম না। 1914 সালেই তিনি নতুন গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন।

মানুষের জানা গ্রহগুলির মধ্যে সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটো। অনন্ত অন্ধকারে প্লুটোর বাস। মাঝে মাঝে শুধু সূর্যের আলোকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে সে। প্লুটো রোমানদের পাতাল দেবতা ছিলেন। তাঁর নামেই সৌর-জগতের নবম গ্রহটির নাম রাখা হল প্লুটো।

প্লুটো এতো দূরে যে সব চেয়ে শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে পৃথিবী থেকে মনে হয় ক্ষুদ্র একটি আলোক বিন্দু। সবিস্তারে প্লুটোকে পরীক্ষা করবার যথেষ্ট সময় এখনো পাওয়া যায়নি। প্রথম আবিষ্কারের পর এখনো প্লুটো সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পারেনি। কেননা, সূর্যের চারদিকে একবার পাক খেতে প্লুটোর সময় লাগে প্রায় 250 পৃথিবী-বছর। কিন্তু প্লুটোকে প্রথম দেখা গেছে আজ থেকে মাত্র বিয়াল্লিশ বছর আগে।

আপন মেরুদণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে প্লুটো নিজের চারদিকে পাক খায় কিনা এখনো জানা যায়নি। তেমনি জানা যায়নি প্লুটোর আবহমণ্ডলের খবর এবং তার কোন উপগ্রহ আছে কিনা।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক তো সন্দেহ করেন—প্লুটো হয়তো নেপচুনের একটা উপগ্রহ ছিল। আকস্মিক কোন কারণে কক্ষচ্যুত হয়ে নতুন পথে সূর্যের চারপাশে চক্কর দিতে সুরু করেছে। মোট কথা প্লুটোর উৎপত্তি এবং অবস্থান আজো গভীর রহস্যে ভরা।

প্লুটোকে ছাড়িয়ে আরো দূরে আর কোন গ্রহ আছে কিনা কে জানে! কে জানে অদূর ভবিষ্যতে নতুন গ্রহ আবিষ্কারের চমকপ্রদ কাহিনী শুনবো কিনা!

গ্রহ-সম্রাট সূর্য

ছোট্ট শিশু। হয়তো পা ফেলে ভালভাবে হাঁটতে শেখেনি। মুখের কথাও হয়ত স্পষ্ট হয়নি। সেও চেনে সূর্যকে।

শীতের সকাল। কনকনে বাতাস বইছে। হাত-পা যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তখন একটু রোদ পেলে কতো আনন্দ হয় আমাদের। এই রোদ কোথা থেকে আসে ছোট ছেলেরাও জানে। তাই-না তারা শীতের সকালে গান ধরে—'সূর্যি মামা, সূর্যি মামা রোদ ক'রে দে'। সূর্য যেন কতো আপনার। নইলে ছেলেরা তাকে 'মামা' বলবে কেন ?

সত্যই সূর্যের মতো আপনার বস্তু আর বোধ হয় দ্বিতীয় নেই। পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণময় পদার্থের উৎস হলো সূর্য। সূর্যের আলো আর উত্তাপ ছাড়া কোন জীব বাঁচতে পারে না। সূর্য ছাড়া এই বিশ্ব-সংসার একেবারে অচল। সূর্য ছাড়া পৃথিবীর অবস্থিতি অসম্ভব। সূর্য আছে বলেই এতো তাপ, এতো আলো ; এতো সৌন্দর্য, এতো আনন্দ।

খুব প্রাচীনকালেও লোকে জানতো, সূর্য বিনা এ পৃথিবীতে প্রাণী থাকা সম্ভব নয়। সূর্যের জন্যই প্রাণময় জগতের অস্তিত্ব। তারা ভাবতো—সূর্য হলেন সদাশয় দয়ালু দেবতা ! প্রাচীন গ্রীসের লোক সূর্যকে বলতো হিলিয়াস, রোমানরা বলতো ফিবাস বা এ্যাপোলো।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা—গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল-এর ধারণা হলো—সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এমনকি অন্যান্য গ্রহ এবং নক্ষত্রগুলোও পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রগুলো কীভাবে শূন্যে থাকে এ তিনি প্রথমে বলতে পারেননি। তারপর অনেক ভেবে-চিন্তে অ্যারিস্টটল বললেন—পৃথিবীর উপরে আটটি কঠিন এবং স্বচ্ছ মণ্ডল আছে এবং তারা সব সময়েই ঘুরছে। সবচেয়ে কাছেরটি হলো চন্দ্র-মণ্ডল। তারপর বুধ, তারপর শুক্র, তারপর সূর্য-মণ্ডল। সূর্য-মণ্ডলের পরে মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি। এবং সবশেষে নক্ষত্র মণ্ডল।

কিন্তু এই মণ্ডলগুলো ঘোরে কিসে?

অ্যারিস্টটল বললেন—বায়ুর শক্তি দিয়ে যেমন পালতোলা জাহাজ চলে, দেহের পেশীর সাহায্যে যেমন মানুষ চলে, তেমনি একটা নবম মণ্ডল আছে, যেটা বাকী আটটা মণ্ডলকে চালায় বা ঘোরায়। এই নবম মণ্ডলের নাম দিলেন তিনি—প্রাথমিক চালিকা শক্তি।

অ্যারিস্টটলের মতবাদ শুনে সে-যুগের পুরোহিতরা হেসে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁরা বললেন—এতো এক তাজ্জব ব্যাপার।

রোমান দেবতা হিলিয়াস সূর্য-রথে চেপে আগুনের মত তেজী ঘোড়াগুলোকে আকাশ-পথে চালনা করেন—একথা অ্যারিস্টটল স্বীকার করে না, বলে কিনা সূর্য হলো একটা জ্যোতিষ্ক—আর আপনা থেকেই পৃথিবীকে চক্কর দেয়। যত সব অধর্মের কথা।

তাঁরা তাড়িয়ে দিলেন অ্যারিস্টটলকে স্বদেশ থেকে। বিদেশেই একদিন তাঁর মৃত্যু হলো।

অ্যারিস্টটলের মৃত্যুর পাঁচশো বছর পর বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কে আরো এক নতুন মতবাদ প্রচার করলেন বিজ্ঞানী টলেমী।

টলেমীর দর্শন এতোই জটিল ছিল যে, টলেমী নিজেই তা স্বীকার করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন—'গ্রহগুলি কী ক'রে চলে তা বোঝাবার চেয়ে আমার পক্ষে গ্রহগুলো চালানো আরো সহজ।'

সে-যা-হোক পরবর্তীকালে টলেমীর মতবাদ চার্চ আর মন্দিরের পুরোহিতরা মেনে নেয়। অবশ্য তার কারণও ছিলো। বাইবেলে কথিত বিশ্বসৃষ্টির কাহিনীর সঙ্গে অনেক মিল আছে টলেমীর মতবাদে। শুধু পার্থক্য—টলেমী বলে পৃথিবী গোল। অথচ বাইবেলে লেখা আছে পৃথিবী চ্যাপটা।

আরো লেখা আছে—ঈশ্বর শুরুতে স্বর্গ মর্ত্য সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর কোন রূপ ছিল না তখন। ছিল শুধু মহাশূন্য। তারপর ঈশ্বর প্রথম দিনে পৃথিবী থেকে আলো আর অন্ধকার পৃথক করলেন। দ্বিতীয় দিনে সৃষ্টি করলেন স্বর্গ, নিরেট স্বর্গ। তৃতীয় দিনে জল থেকে শুকনো ডাঙ্গা; তারপর ঈশ্বর সেই ডাঙ্গায় গাছপালা তৈরী করলেন। চতুর্থ দিনে সৃষ্টি করলেন চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য তারকা।

বাইবেলের এই সব ওলট-পালট কথা শুনলে অবাক লাগে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে—প্রথম দিনে পৃথিবীতে দেখা দিল আলো আর চতুর্থ দিনে সৃষ্টি হলো সূর্য—তাহলে আলো কোথা থেকে এলো!

প্রায় পনেরশো বছর ধ'রে এই সব ভ্রান্ত মতবাদ চলে এসেছে। তারপর ষোল শতকের প্রথমেই নিকোলাওস কোপার্নিকাস সর্বপ্রথম টলেমীর মতবাদের বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন :

চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে একথা সত্য। কিন্তু বুধ, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগুলো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এমন কি পৃথিবী নিজেও অন্যান্য গ্রহদের মত সূর্যকেই প্রদক্ষিণ করে।

তিনি আরো বললেন :

বিশ্বজগতের স্থির কেন্দ্র হিসাবে পৃথিবীকে ধরা চলে না। বরং সূর্যই বিশ্বজগতের স্থির কেন্দ্র-বিন্দু। পৃথিবী নিজের চারদিকে আবর্তন করে ব'লেই মনে হয় সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

কোপার্নিকাসের মৃত্যুর পর জিওর্দানো ব্রুনো বিশ্বজগৎ সম্পর্কে কোপার্নিকাসের মত সমর্থন করলেন এবং তা প্রচার করতেও লাগলেন। আর এজন্য তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।

বিশ্বজগৎ বিষয়ে ব্রুনোর ধারণা কোপার্নিকাস-এর ধারণা অপেক্ষা আরো স্পষ্ট এবং সঠিক ছিলো। তিনিই প্রথম বললেন :

শুধু পৃথিবী কেন সূর্যও নিজের অক্ষে ঘোরে।

ব্রুনোর মৃত্যুর অনেক দশক পরে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

সূর্য দেহের উপাদান : আসলে সূর্য হলো একটি নক্ষত্র। আর এই নক্ষত্রকে কেন্দ্র ক'রে বাকী গ্রহগুলো অবিরাম ঘুরছে।

কিন্তু কি দিয়ে গড়া সূর্যের দেহ? আর কোথা থেকেই-বা এলো?

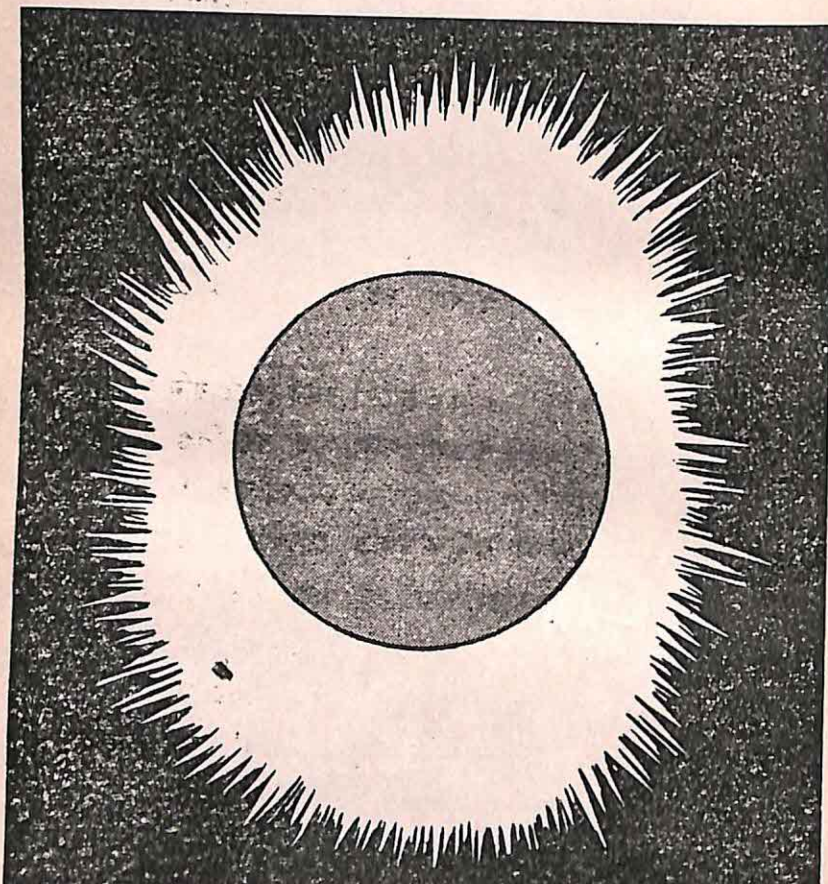
এই সেদিনের কথা। এখনও দু'শো বছর পেরোয়নি। বিজ্ঞানী হর্শেল বললেন—সূর্য একটি শীতল গোলাকার বস্তু-পিণ্ড। পৃথিবীর মত সূর্যও প্রাণীর আবাসস্থল। সেখানেও মেঘের স্তর আছে। তবে পর পর দু'টো স্তর গোটা সূর্যকে ঘিরে রেখেছে। উপরের স্তরটি উত্তপ্ত এবং উজ্জ্বল; ভিতরের স্তরটি ঘন এবং শীতল। আলোকিত এবং তপ্ত উপরের স্তর থেকেই আমরা আলো এবং তাপ পেয়ে থাকি।

কিছুদিন যেতে না যেতেই সূর্য সম্পর্কে হর্শেলের মতবাদ বাতিল হয়ে গেল। পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানীরা বললেন—সূর্য হচ্ছে গলিত বস্তুর অগ্নিময় পিণ্ড। তরল বস্তু দিয়ে সূর্যের দেহ তৈরী।

শেষের মত-ও এ যুগের বৈজ্ঞানিকগণ বেশীদিন বিশ্বাস করলেন না। তাঁরা সূর্য সম্পর্কে আরও খোঁজ-খবর নিয়ে জানালেন—সূর্যের দেহ তপ্ত গ্যাসের পিণ্ড দিয়ে গড়া। তপ্ত গ্যাস ঠাসা রয়েছে সূর্যের দেহে। কিন্তু কতটা তপ্ত?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কেননা পৃথিবীতে এমন কোন তপ্ত বস্তু নেই যার সঙ্গে সূর্যের দেহের তাপের তুলনা করা চলে। তবুও উত্তর একটা দিতে হবে বৈকি।

সূর্য-দেহের তাপের পরিমাণ ঃ আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় তাপ পাই সূর্যের কাছ থেকে। আমাদের মত পৃথিবীর আর সব প্রাণীও ওই সূর্যের কাছ থেকেই প্রয়োজন মত তাপ পাচ্ছে। যদি আমাদের পৃথিবীর মত আরও দু'হাজার লক্ষ পৃথিবী থাকতো আর যদি সেই সব



সূর্যের চারপাশ

পৃথিবীর লোকজন আপন আপন প্রয়োজনীয় তাপ সূর্যের কাছ থেকে নিতো তবুও সূর্যের ভাণ্ডারের অফুরন্ত তাপ শেষ হতো না। এখন তাহলে চিন্তা করা যেতে পারে, সূর্যের দেহের তাপের পরিমাণ কত। সূর্য-দেহে যে তাপ আছে তার 200 কোটি ভাগের এক ভাগ আমরা

পাই। এই কণামাত্র তাপই পৃথিবীর লোক সব সময় সহ্য করতে পারে না। যদি আরো বেশী তাপ আসতো তা'হলে কি হতে, আমরা ভাবতেই পারি না।

সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা 6 হাজার ডিগ্রি। পৃথিবীর কঠিনতম বস্তু গলতে 3 হাজার থেকে 4 হাজার ডিগ্রি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। তাহলে পৃথিবীর কোন বস্তুই সেখানে তরল অবস্থাতেও থাকতে পারে না।

আরো এক ভাবে আমরা অনুমান করতে পারি সূর্য-দেহে কি পরিমাণ তাপ আছে।

সবার নিশ্চয় মনে আছে, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ন'কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল (বা পনের কোটি কিলোমিটার)। যদি পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত চব্বিশ মাইল চওড়া একটা বরফের রাস্তা তৈরি করা যায়, তাহলে সেই রাস্তার দৈর্ঘ্য হবে ন'কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল। এখন, কোন রকমে সূর্যের তাপের সবটুকু যদি ওই বরফের রাস্তায় ফেলা যায়, তবে একবার চোখের পলক ফেলতে না-ফেলতে সেই বরফের রাস্তা গলে জল হয়ে যাবে। তাহলে এখন বোঝ—কত তাপ আছে সূর্যের দেহে।

ন'কোটি মাইল থেকেও বেশী দূরে আছে সূর্য। এত দূরে না থেকে যদি কোন রকমে একবার ন'লক্ষ মাইল দূরে এসে পড়ে, তাহলে পৃথিবীর বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত এমন কি সাগর-মহাসাগর পর্যন্ত মাত্র এক সেকেণ্ডে দাউ দাউ ক,রে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

এত সুন্দর পৃথিবী এক নিমেষে নিশ্চিহ্ন হওয়ার থেকে সূর্য দূরে থাকাই ভাল। কাজ নেই তার কাছে এসে।

আলোর উৎস : পৃথিবীর চারদিকে যেমন বায়ুর আবরণ আছে তেমনি সূর্য দেহের চারদিকেও পর পর তিনটি আবরণ আছে। এই আবরণগুলো থেকে তাপ এবং আলো বেরিয়ে আসছে। সূর্য-দেহের ঠিক উপরের আবরণটিকে বলে 'আলোক মণ্ডল'। আলোক মণ্ডলই

আলোর উৎস। আলোক মণ্ডলে প্রতিনিয়তি আগুনের ঝড় উঠছে। ওই ঝড় পৃথিবীর ঝড়ের মত ক্ষণকালের জন্য নয়। এক এক সময় ওই ঝড় ভীষণ আকার ধারণ করে এবং মাসের পর মাস স্থায়ী হয়। আর ছড়িয়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত।

আলোক মণ্ডলের পরেই 'বর্ণ মণ্ডল'। সূর্য-দেহে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে। আগুনের লেলিহান শিখার যে লাল রঙ, তার উৎপত্তি ওই বর্ণ মণ্ডল থেকে। বর্ণ মণ্ডলের এক একটি শিখা হাজার হাজার মাইল পর্যন্ত উঁচু। বর্ণ মণ্ডলকে ঘিরে আছে 'ছটা মণ্ডল'। ছটা মণ্ডলই আলোক ছটার কেন্দ্রস্থল।

সূর্যের আয়তন ঃ এতো গেল সূর্যের তাপ আর আলোর কথা। এবারে তার আয়তনের কথা বলি। ভোরবেলায় সূর্য যখন ওঠে অথবা বিকেলবেলায় সূর্য যখন ডোবে তখন আমরা একে দেখি একটা থালার মত গোল। দিনের সব সময় অবশ্যি সূর্যের দিকে তাকান যায় না। তবে দেখতে সে-যে বিরাট কিছু নয়, তা আমরা প্রতিদিনই দেখেছি।

কিন্তু সত্যই কি তাই? আমাদের চোখের দেখাটাই কি সব?

বহু দূরের গাছপালা ঘর-বাড়ী-সব কিছু ছোট দেখায়। কাছে গেলেই আমরা বুঝতে পারি, দূর থেকে যাদের এত ছোট দেখছি, আসলে তারা কত বড়। সাততলা বাড়ীখানা অথবা পুকুর-পাড়ের তাল গাছ আকাশ ছুঁই ছুঁই করে। অথচ দূর থেকে দেখে মনে হয়—একটা যেন একতলা বাড়ী অথবা ছোট্ট একটা গাছ।

এমনই হয়। আরো পাঁচটা সত্য ঘটনার মত এও সত্য যে, দূরের জিনিস আমরা ছোট দেখি। সূর্য যে আমাদের থেকে দূরে আছে সে-তো আমাদের জানা, কত দূরে আছে সেও জানি। তা হলে সূর্য যে অনেক ছোট দেখাবে তাতে আর অশ্চর্য কি!

কিন্তু কতটুকু ছোট দেখাবে? তার মানে সূর্য দেহের আসল আয়তন কত?

চট করে উত্তর দেওয়া একটু মুস্কিল ব্যাপার। আমাদের এই

পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে তুলনা করে বলতে পারি সূর্য অমুক জিনিসের মত বড়।

তাহলে সূর্য কি পৃথিবীর মত বড় ?

পৃথিবী তো আর কম বড় নয়। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ কত বড়। এই রকম অনেকগুলো দেশ নিয়ে একটা মহাদেশ। আর গোটা পৃথিবীতে সাতটি মহাদেশ (১) রয়েছে। শুধু তাই নয়।

সবগুলো মহাদেশের যে মোট আয়তন তার তিনগুণ পরিমাণ জল নিয়ে পাঁচটা মহাসাগরও (২) আছে। পৃথিবীর আয়তন তাহলে কত বড় !

এই পৃথিবী থেকেও কি সূর্যের আয়তন বড় ?

হ্যাঁ, বড়। সূর্য পৃথিবী থেকেও বড়। সব চাইতে যে বড় গ্রহ বৃহস্পতি, যার আয়তন এক হাজার তিনশ' পৃথিবীর আয়তনের সমান, তার থেকেও সূর্য বড়। তের লক্ষ পৃথিবী এক জায়গায় জড়ো করলে যত জায়গা নেবে, সূর্য একাই তত জায়গা নেবে। এখন অনুমান কর—সূর্যের কত আয়তন !

আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য 13 লক্ষ গুণ বড় হলেও ওজনে বড় মাত্র 3 লক্ষ 30 হাজার গুণ। কেননা যে সব মালমসলা দিয়ে পৃথিবীর গঠন তার ঘনত্ব অনেক বেশী সূর্যদেহের মালমসলা থেকে। সূর্য-দেহের মালমসলা তো শুধু তপ্ত ভাপ আর তপ্ত গ্যাস। তার ওজন তো কম হবেই।

অফুরন্ত শক্তির আধার এই সূর্য। সূর্য-দেহের মহাকর্ষের পরিমাণ এতই বেশী যে, ছোট-বড় ন'টি গ্রহ এবং কোটি কোটি গ্রহ-কনিকাদের নিজের চারপাশে বন বন ক'রে ঘোরাচ্ছে। সৃষ্টির কোন্ আদিতে সুরু হয়েছে এই ঘোরানোর কাজ, আজও তার শেষ

(১) এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া এবং ওশেনিয়া।

(২) প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, সুমেরু মহাসাগর (আর্কটিক) এবং কুমেরু মহাসাগর (এ্যান্টার্কটিক)।

হয়নি—সমানতালে ঘুরে চলেছে। এক মুহূর্তের জন্যও এর বিরাম নেই। তবে বিরাম ঘটলে কি হতো জানো? গ্রহগুলো কোথায় যে ছিটকে পড়তো তার হদিস কোনদিন পাওয়া যেতো না।

সূর্যের এ শক্তির কি শেষ নেই? কোটি কোটি বছর ধ'রে সূর্য যে তার দেহের তাপ এবং আলো বিলিয়েই চলেছে, তাতে কি সে কোনদিন দেউলে হবে না?

হয়তো হবে। কিন্তু কবে হবে সে খবর কেউ জানে না। হয়তো আরও কোটি কোটি বছর ধরে সমানভাবে তাপ ও আলো বিলিয়ে গেলেও সূর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডারে তখনও অনেক তাপ বাকী থাকবে।

সূর্যের কলঙ্ক: প্রাচীনকালে লোকে ভাবতো—সূর্যের চেয়ে নিখুঁত জ্যোতিষ্ক আর থাকতে পারে না। নিষ্কলঙ্ক সোনা দিয়ে যেন ওর দেহ তৈরী—কোন খুঁত নেই ওতে।

কিন্তু মানুষ হতাশ হলো গ্যালিলিওর দূরবীন আবিষ্কারের পর। দূরবীন দিয়ে তিনি দেখলেন—কালো কালো দাগে সূর্যের দেহ কলঙ্কে ভরা। কিন্তু তাঁর কথা প্রথমে কেউ বিশ্বাস করেনি।

একজন প্রাচীন বিজ্ঞানীর কাছে গিয়ে তিনি বললেন—সূর্যের দেহে কালো কালো দাগ দেখা গিয়েছে।

শুনে পুরাতনপন্থী বিজ্ঞানীটি বিজ্ঞের মতে বললেন, ভাই, পুরনো সব বই আমি অনেকবার পড়েছি, জোর ক'রে বলতে পারি যে তোমার দেখা দাগের কথা কিছু নেই সেগুলোতে। ভালোয় ভালোয় যাও, আর মনে রেখো, দাগগুলো শুধু তোমার চোখেই আছে।'

পরে অবশ্য সবাইকে মানতে হলো সত্যি সত্যিই সূর্যের গায়ে দাগ আছে। সূর্য-দেহ নিখুঁত নয়। তখন থেকেই মানী লোকদের দোষ-ত্রুটি ঢাকবার জন্য বলা হয়—সূর্যেরও কলঙ্ক আছে।

কিন্তু এই দাগ বা কলঙ্ক কি?

বিজ্ঞানীদের মতে ওগুলো সূর্যের বুকে গড়ে-ওঠা প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড গ্যাস-আবর্ত। কিন্তু কেন ওদের সৃষ্টি তা তাঁদের জানা নেই।

সূর্যের গায়ে কালো দাগ বলতে আমরা যেন না ভাবি সেগুলো সত্যিই কালো। আসলে ওই দাগগুলোর জায়গায় সূর্য-দেহের তাপমাত্রা কম। অর্থাৎ সূর্য-দেহে ৫000 ডিগ্রি তাপমাত্রার জায়গায় ওই দাগগুলোতে 4৫00 ডিগ্রি তাপমাত্রা, আশপাশ থেকে 1200 ডিগ্রি কম। ব্যাপারটা যেন বিজলীবাতি জ্বালা ঘরে একটা দেশলাই এর কাঠি জ্বালানোর মত। বিজলী বাতির উজ্জ্বলতায় জ্বলন্ত এই কাঠিটি কালো বলেই মনে হবে।

দাগগুলো লম্বায় চওড়ায় বিরাট— এক একটা লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার।

বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন— সূর্য-দেহের কলঙ্কের জন্য আমাদের পৃথিবীর আবহাওয়ার কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। সূর্য-দেহে যে-বছর যত কলঙ্ক দেখা দেয় সে-বছর তত বেশী ঝড় হয় আমাদের পৃথিবীতে। এ এক অদ্ভুত যোগাযোগ পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের।

কিন্তু সৌর-জগতের এই অধিপতিও আবার আর এক জগতের অধীন। পৃথিবী যেমন তার নিজের মেরুদণ্ডে দাঁড়িয়ে ঘোরে আবার সূর্যকেও পাক দেয়, ঠিক তেমনি সূর্যও নিজের মেরুদণ্ডে দাঁড়িয়ে ঘুরছে এবং সেই সঙ্গে তার গ্রহ-পরিবারকে নিয়ে পৃথিবীর মতই আর এক মহাসূর্যের চারপাশে পাক দিচ্ছে।

প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 175 মাইল বেগে সূর্য নিজের চারপাশে ঘুরছে। আর সেই মহাসূর্যের চারপাশে পাক দিয়ে আসতে আমাদের সূর্যের সময় লাগছে 250C0মিলিয়ান পৃথিবী-বছর! সূর্য কতকাল থেকে এভাবে মহাসূর্যের পাশ দিয়ে ঘুরছে কেউ আজ জানেন না। তবে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন— পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত মোট চারবার আমাদের সূর্য তার গ্রহ-উপগ্রহদের নিয়ে সেই মহাসূর্যকে চক্কর দিয়ে এসেছে।

এসব কথা শুধু কল্পনা দিয়েই বুঝতে হবে।

গ্রহগুলোর সৃষ্টি সূর্যের দেহ থেকে। গ্রহদের যা কিছু আলো যা কিছু শক্তি-সামর্থ্য সবই ওই সূর্য থেকে পাওয়া। এমন কি, ওরা যে নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট গতিতে সূর্যের চার পাশে ঘুরছে তা যেন ওই সূর্যেরই হুকুমে। তাই সূর্যকে বলা হয় 'গ্রহ সম্রাট'। অথবা, গ্রহ উপগ্রহ এবং গ্রহ-কণিকাদের নিয়ে যে জগৎ তাকেই বলা হয় *সৌরজগৎ। আর সেই সৌরজগতের অধিপতি স্বয়ং সূর্য।

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রবন্ধটি প্রচারিত হয়েছে।

তারার কথা

দিনের শেষ ; রাতের সুরু। আলো আঁধারের মাখামাখি। পূব আকাশ তখনো কালো হয়নি ; পশ্চিম আকাশের তামাটে রঙ তখনও ঘোচেনি। সেই সময় উপরের দিকে চাইলে দেখা যাবে, আকাশের গায়ে এদিক ওদিক দু'একটা বিন্দু চিক চিক করছে।

আরো একটু পর যখন কালো চাঁদোয়া সারা আকাশ ঢেকে দেয়, তখন এদিক-ওদিকের সেই দু'একটি চিক-চিকে বিন্দু বেড়ে যায় হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে। মনে হয়, যেন আকাশের মিশমিশে কালো গায়ে অসংখ্য দীপ জ্বলছে। ওদের কতকগুলো খুব উজ্জ্বল, দপ্ দপ করে ; আর কতকগুলো খুব ম্লান, যেন মিট্ মিট্ করে। কয়েকটি ছাড়া ওদের প্রায় সকলেই হচ্ছে এক-একটি নক্ষত্র বা তারকা। চলিত কথায় শুধু 'তারা'। যেগুলো নক্ষত্র নয়, সেগুলো হয় 'গ্রহ, উপগ্রহ', না হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের সমষ্টি 'গ্রহাণুপুঞ্জ'।

শুনে অবাক হতে হয়, অগুন্‌তি নক্ষত্রের মাঝে আমাদের সূর্যও একটি নক্ষত্র। সূর্যের যেমন নিজের আলো আছে, প্রতিটি নক্ষত্রের তেমনি নিজের আলো আছে। কিন্তু প্রশ্ন—তারাগুলো যদি এক-একটি সূর্য হয়, তবে সূর্যের মত তেজ নেই কেন?

সূর্যের মতই প্রত্যেকটি তারার আলো আছে, তাপ আছে। বরং ওদের কোন কোনটির তাপ ও আলোর পরিমাণ সূর্যের থেকেও শত শত গুণ বেশী।

তবু তাদের তেজ বোঝা যায় না কেন ?

কারণ, এক-একটি তারার তুলনায় সূর্য আছে আমাদের খুব কাছে। যেন একই দেশে। একই দেশ না-হোক, একই জগতে তো বটে। সেই-যে সৌর-জগতের কথা বলছি। সূর্য ও পৃথিবী উভয়েই সৌরজগতের অধিবাসী। তাইতো ওরা কাছাকাছি থাকে। আর এ জন্যই সূর্য আমাদের কাছে এত বড়। এ জন্যই এত তার তাপ, এত তার আলো। কিন্তু সূর্য ছাড়া আর সব তারাগুলো পৃথিবী থেকে এতই দূরে যে, ওদের তাপ আসে না; আসে শুধু আলো। কিন্তু সে আলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর বিন্দুর মত।

সূর্য আছে পৃথিবী থেকে ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে (পনের কোটি কিলোমিটার) সূর্যকে বাদ দিয়ে যে-তারাটি পৃথিবীর সব চাইতে কাছে আছে তার নাম দেওয়া হয় প্রক্সিমা [লাটিন ভাষাই প্রক্সিমা মানেই 'সবচেয়ে কাছের তারা']। এই কাছের তারার দূরত্ব পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল বা উনচল্লিশ লক্ষ কোটি কিলোমিটার।

আরো একভাবে এ দূরত্ব বোঝানো যেতে পারে। ঘণ্টায় 1000 কিলোমিটার বেগে একটা মেলট্রেণে রওনা হলে সূর্যে পৌঁছুতে সময় লাগবে 173 বছর কিন্তু প্রক্সিমাতে প্রায় সাড়ে চার কোটি বছর। দূরত্বের এই হিসেব দেখলে আমাদের দিশেহারা হতে হয়। এর হিসেব করা ধারাপাতের বিদ্যের কুলোয় না। বিজ্ঞানীরা তাই নক্ষত্রদের দূরত্ব মাপবার জন্য সুন্দর এক মাপকাঠি ঠিক করেছেন।

একটুকরো কাগজের উপর যখন ছবি আঁকি তখন ইঞ্চি হলেই চলে। কিন্তু বসবার ঘরটা মাপার জন্য চাই ফুট; আর খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য মাপতে হলে গজফিতা না হলে চলে না। কিন্তু কলকাতা থেকে দিল্লী বা বোম্বাই কতদূর জানতে হলে হিসেব করতে হয় মাইল বা কিলোমিটার দিয়ে। আমাদের দেশের বাইরে কোন জায়গা কতদূর তাও জানি আমরা মাইল দিয়ে। এমন কি সূর্য, চন্দ্র অথবা আর আর গ্রহ-উপগ্রহ কতদূরে আছে তারও হিসেব করি মাইল দিয়ে। কিন্তু নক্ষত্রের দূরত্বের হিসেব মাইলে করা চলে না।

কারণ সূর্য ছাড়া পৃথিবীর সব চাইতে কাছের নক্ষত্রটির দূরত্ব পঁচিশের পিঠে 12টি শূন্য দিলে যত হয় তত মাইল। অথবা চল্লিশের পর 12টি শূন্য দিলে যত হয় তত কিলোমিটার। যদি কাছের তারাটির বেলায় এই অবস্থা হয় তাহলে যারা আরও দূরে আছে তাদের আমরা কিভাবে মাপতে পারি ?

তাই নতুন মাপকাঠি তৈরী করলেন বৈজ্ঞানিকেরা।

আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বা তিন লক্ষ কিলোমিটার। তার মানে হঠাৎ একটা দীপ জ্বললে তার আলো মাত্র এক সেকেণ্ডে ছুটে যাবে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বা তিন লক্ষ কিলোমিটার দূরে। এখন যদি বলি কোন একটা জিনিস এক 'আলো-সেকেণ্ড' দূরে আছে, তাহলে বুঝতে হবে, সেটা আসলে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বা তিন লক্ষকিলোমিটার দূরে আছে। সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল বা চৌদ্দ কোটি সাতানব্বই লক্ষ কিলোমিটার। সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগবে 480 সেকেণ্ড বা 8 মিনিট [নিখুঁত ভাবে 500 সেকেণ্ড বা 8 মিনিট 20 সেকেণ্ড]। সুতরাং আমরা বলবো— পৃথিবী হতে সূর্যের দূরত্ব হচ্ছে 480 'আলো-সেকেণ্ড' বা 8 'আলো-মিনিট'। তেমনি পৃথিবীর নিকটতম তারা 'প্রক্সিমা সেন্টরাই'-এর দূরত্ব সাড়ে চার 'আলো-বছর' অর্থাৎ $4\frac{1}{2} \times 365\frac{1}{4} \times 24 \times 60 \times 60 \times 186000$ মাইল বা $4\frac{1}{2} \times 365\frac{1}{4} \times 24 \times 60 \times 60 \times 300000$ কিলোমিটার।

আগেই বলেছি, প্রতিটি তারার নিজস্ব আলো আছে। কিন্তু গ্রহগুলোর কোন নিজস্ব আলো নেই। তবুও আমরা গ্রহগুলোকে খানিকটা আলোকিত দেখি—এর কারণ কি ?

জ্বলন্ত কোন দীপের সামনে একটা আয়না ধরলে দেখা যায়, দীপের আলো আয়নার গায়ে ধাক্কা খেয়ে উল্টো দিকে যায়। ধাক্কা খেয়ে উল্টো দিকে যাওয়াকে ভাল কথায় 'প্রতিফলিত হওয়া' বা 'আলোর প্রতিফলন' বলে। দীপের আলোর এই প্রতিফলনের মত সূর্যের আলো গ্রহগুলোর দেহ থেকে ধাক্কা খেয়ে প্রতিফলিত হয়ে

আমাদের চোখে আসে। তাই আমরা গ্রহদের উজ্জ্বল দেখি। আসলে কিন্তু এদের নিজের কোন আলো নেই।

নিজের আলো না থাকলেও গ্রহ যখন উজ্জ্বল দেখায়, তখন গ্রহকে নক্ষত্র থেকে পৃথক ক'রে চেনবার উপায় কি?

নক্ষত্র যেন সর্বদাই ঝিক্‌মিক্ করছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু গ্রহদের আলো স্থির; ঝিক্‌মিক্ করে না। অবশ্য চেনার আরো উপায় আছে। কয়েকদিন ধ'রে একটা গ্রহের অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কোন একটি বিশেষ নক্ষত্রের তুলনায় কোন একটি বিশেষ গ্রহ ক্রমাগত বেশী তাড়াতাড়ি দূরে সরে যাচ্ছে। আরো একটি উপায়—খুব শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে দেখলে গ্রহদের অপেক্ষাকৃত বড় দেখায়; কিন্তু নক্ষত্রদের বড় দেখায় না। অবশ্য সূর্যের কথা বাদ দিয়েই বলছি।

শুধু রাতের আঁধারেই আমরা তারা দেখি। দিনের আলোতে দেখি না। আবার পূর্ণিমার রাত অপেক্ষা অমাবস্যার রাতে ওদের আরো বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। এখন মনে হতে পারে, দিনের বেলায় ওরা আকাশ ছেড়ে পালায় কোথায়?

ওরা আকাশ ছেড়ে কোথাও পালায় না। রাতের আকাশে যেমন থাকে ঠিক তেমনি থাকে দিনের আকাশে। দিনের আলোর জন্যই ওদের আমরা দেখতে পাই না। সূর্যের আলোর তুলনায় ওদের আলো এতই ক্ষীণ যে, নীল আকাশের গায়ে ওরা মিলিয়ে থাকে। সূর্য যখন ডুবু ডুবু করে, যখন আকাশের নীল রঙ আস্তে আস্তে কালো হয়; তখনই আকাশের সেই কালো গায়ে একে একে ওরা ফুটে ওঠে। আকাশ থেকে হঠাৎ যদি কোন দিন সূর্য পালিয়ে যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে নীল আকাশ ছেয়ে যাবে মিশ্‌মিশে আঁধারে। আর সেই আঁধার গায়ে তখুনি ফুটে উঠবে শত সহস্র তারা।

লক্ষ কোটি তারার মাঝে ক'টাকেই-বা আমরা খালি চোখে দেখি! মাত্র ছ'হাজার! তবে শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে জ্যোতির্বিদ্‌গণ কয়েক কোটি তারার খোঁজ পেয়েছেন আর টেলিস্কোপ দিয়ে তোলা ফটোতে ধরা পড়েছে আরো কোটি কোটি তারা।

আমাদের কাছে তারাগুলো সব একই রকম দেখতে। শুধু ছোট আর বড় এই যা তফাৎ। তা ছাড়া মনে হয়, সবগুলোই যেন সমান দূরে। কিন্তু আসলে ওরা সবাই সমান দূরে নেই। বড় একটা ফাঁকা মাঠের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আর এক প্রান্তের দিকে তাকালে মনে হয়, দূরের গাছগুলো যেন একই দূরত্বে আর একই সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সেই গাছগুলোর কাছে গেলে দেখা যাবে, কোন গাছ অনেক আগে, কোন গাছ অনেক পিছে আছে। অথচ দূর থেকে দেখলে মনে হয় ওরা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। তারাগুলোর বেলাতেও ঠিক এমনি চোখের ভুল। কোন কোন তারা আমাদের অনেক কাছে আছে, আবার কোন কোন তারা অনেক দূরে দাঁড়িয়ে, তবুও মনে হয়, ওরা একই দূরত্ব থেকে যেন হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকছে আর মিটিমিটি হাসছে।

প্রতিটি নক্ষত্র এক একটি সূর্য। আলোর সাহায্যে ওরা ওদের অস্তিত্বের বার্তা পাঠায় আমাদের কাছে। আলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছায় না। আগেই তো বলেছি, তিন লক্ষ কিলোমিটার দূরত্ব আস্তে আলোর সময় লাগে এক সেকেণ্ড। পৃথিবীর মানুষের কাছে দূরত্বের সঙ্গে আলোর গতিটা এমন কিছুই নয়। কিন্তু তারাদের দূরত্বকে অতিক্রম করতে সেই আলোরই সময় লাগে বেশী। সব থেকে কাছের তারটির (সূর্য ছাড়া) কাছ হতে আলো আসতে সময় লাগে চার বছরেরও বেশী। আর যারা আরো দূরে আছে তাদের আলো আমাদের কাছে আসতে হাজার হাজার বছর লাগে।

আজ যে তারা আমরা দেখছি। সে তারা তার অতীত অবস্থা। এটা বোঝার জন্য একটা অসম্ভবকে কল্পনা করা যেতে পারে—

আজ এক সঙ্গে সবগুলো তারা নিভে গেল। আজই কি আমরা দেখবো আকাশের গায়ে আর কোন তারা নেই ?

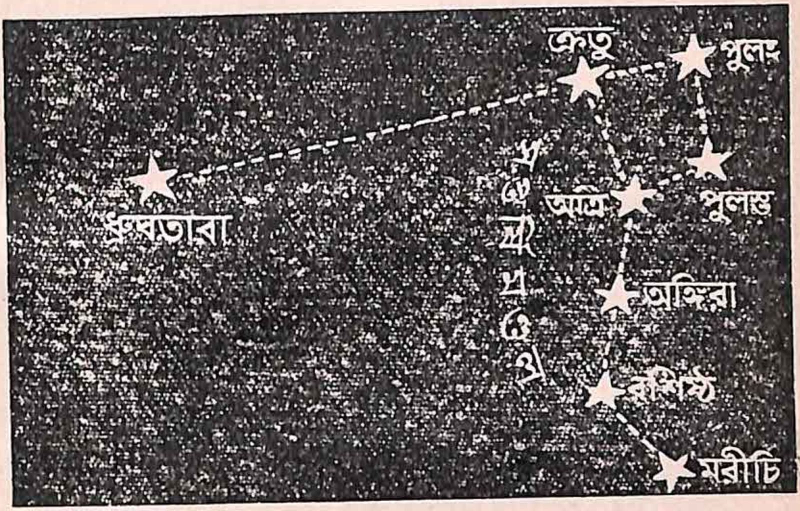
না, তা দেখবো না। সর্বনাশের অন্তত সাড়ে চার বছর বাদে প্রক্সিমা আকাশের গা থেকে উধাও হবে। বাকিগুলো সব তেমনিই থাকবে। আরো দু'তিন বছর পরে, আরো কয়েকটি মুছে যাবে।

তারপর একে একে মিলিয়ে যেতে থাকলেও শত শত হাজার হাজার বছরেও তারা-ভরা আকাশ তারার দীপ্তি থেকে নিশ্চিহ্ন হবে না। লক্ষ লক্ষ বছর পরেও শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে মানুষ আকাশের গায়ে তারা দেখতে পাবে—অবশ্য ততোদিন পৃথিবীতে কোন মানুষ থাকলে।

ভোর হতে-না-হতেই পূব আকাশে সূর্য ওঠে, আবার সন্ধ্যার আগেই পশ্চিম আকাশে ডুবে যায়। এটা এমন কিছু নতুন কথা নয়। সূর্যের এই 'ওঠা' আর 'ডোবা'কে ভাল কথায় বলে 'উদয় হওয়া' আর 'অস্ত যাওয়া'। নক্ষত্রের 'উদয় অস্ত' আছে। এরাও ঠিক সূর্যেরই মত আকাশের বুকে ঘুরে বেড়ায়। কারো উদয় হয় সন্ধ্যার আগেই, কারো পরে; কারো-বা মাঝ রাতে, কারো আবার ভোরের দিকে। সারা রাত না ঘুমিয়ে যদি কেউ আকাশের দিকে চেয়ে থাকে তাহলে দেখবে কত তারা উঠছে, কত ডুবছে। সবাই এগিয়ে যাচ্ছে পূব থেকে পশ্চিমে। শুধু একটি তারা বাদ দিয়ে।

সারা আকাশের গায়ে শুধু একটি তারা আছে যে কোথাও কোন-দিন নড়াচড়া করে না। যুগ-যুগান্তর ধ'রে একই জায়গায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এরই নাম 'ধ্রুব-তারা'। খাপছাড়া এই তারাটি চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে মানুষের কত যে উপকার ক'রে আসছে তার ইয়ত্তা নেই। আগের দিনে এখনকার মত দেশে এত যন্ত্রপাতি ছিল না। লোহার জাহাজ যখন তৈরী হয়নি, যখন চুম্বকের ব্যবহার মানুষ জানতো না, তখনকার দিনের কথা বলছি। কাঠের তৈরী পালের জাহাজ সাগরের বুকে ভাসিয়ে নাবিক আর সওদাগরেরা যখন দেশ-দেশান্তরে পাড়ি দিতো তখন ওই ধ্রুব-তারাই ছিল রাতের আঁধারে একমাত্র দিগ্‌দর্শন। রাতের বেলায় কালো আকাশের নিচে এবং সাগরের কালো জলের উপরে কত নাবিক দিক হারিয়ে ফেলতো। তখন ওই ধ্রুব-তারাই তাকে সঠিক পথের নিশানা দিতো। আজ আর সেদিন নেই। এখন আবিষ্কার হয়েছে কলের জাহাজ, আবিষ্কার হয়েছে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। তাই ধ্রুব-তারার প্রয়োজনীয়তাও

এখন শেষ হয়ে গেছে। তাতে অবশ্য ধ্রুব-তারার কিছু যায় আসে না। অনাদিকাল থেকে সে যেমন দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে অনন্তকাল ধ'রে, যদি-না মহাকালের বুকে কোন মহাবিপর্যয় ঘটে।



ধ্রুবতারাকে যেভাবে চেনা যাবে

ইচ্ছে করলে ধ্রুব-তারাকে সহজেই চিনে নিতে পারা যায়। উত্তর আকাশের গায়ে এক জায়গায় সাতটি তারা কাছকাছি থাকে; একটি রেখা দিয়ে ওদের যোগ করলে মনে হয়, একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন (?)। এ সাতটি তারার নাম—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ। এই নামগুলো কিন্তু সাতজন ঋষির নাম। পুলহ থেকে ক্রতু পর্যন্ত একটি রেখা টেনে আরো কিছু দূর বাড়ালে সেই রেখাটি ধ্রুবতারাকে স্পর্শ করবে। ওই রেখা কিন্তু আমাদের কল্পনার। আকাশের বুকে রেখা টানা যাবে কি করে!

সূর্যের মতই প্রতিটি তারা এক একটি জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। ওদের আয়তন এতো বড় আর তাপ ও আলোর পরিমাণ এতো বেশী যে কোটি কোটি বছর ধ'রে তাপ এবং আলো বিলিয়েও ওরা শীতল বা নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি। এমন তারাও আকাশের গায়ে আছে যারা

আমাদের সূর্যের চেয়েও শত শত গুণ বড়। তবে সূর্যের চেয়ে ছোট ছোট তারারও অভাব নেই।

বিজ্ঞানী জীন্‌স বলেন—খুব বেশী বয়স হলে অনেক তারা দীপ্তি-হীন ও অদৃশ্য হয়ে যায়। তাছাড়া বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওদের রঙ-ও বদলায়। প্রথম বয়সের তারা নীলাভ, মাঝ বয়সের তারা সাদা আর শেষ বয়সের তারা পীত ও লালচে রঙ-এর। বয়সের দিক থেকে আমাদের সূর্য প্রায় প্রৌঢ়। এমন একদিন আসবে, যখন সূর্য বুড়ো হয়ে দীপ্তি আর তাপ হারাবে। তখন কোথাও তাকে আর দেখা যাবে না। তবে মানুষের ইতিহাসে সেই ভয়ঙ্কর দিন আসতে এখনও কোটি কোটি বছর বাকী। কাজেই ভাবনার কিছু নেই।

উল্কা ও ধূমকেতু

উল্কার কথা

রাতের আঁধারে তারাগুলোর দিকে চেয়ে থাকলে অনেক সময় আমরা দেখি একটা তারা যেন খ'সে পড়লো আকাশের গা থেকে। আকাশের গা থেকে 'খসে-পড়া' ওই তারাটি নিচের দিকে নামতে নামতে হঠাৎ দেখি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। এই 'তারা-খসা' ব্যাপারটি আসলে কিন্তু অন্য রকম। সত্য সত্যই কোন তারা খ'সে পৃথিবীর দিকে আসে না'বা পৃথিবীর গায়ে পড়ে না।

অনেক অনেক দিন আগে লোকে ভাবতো, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব তারা আছে। মানুষ যখন মারা যায় তখন তার তারাটিও নিভে যায় সেই মুহূর্তে।

তাই উজ্জ্বল একটা তারা আকাশের গায়ে ছুটতে দেখলে ধর্মভীরু লোকেরা বুকে হাত দিয়ে বলতো, কী জানি কার আত্মা ফিরে গেল ভগবানের কাছে।

আসলে কিন্তু এই খসা-তারা বা পড়ন্ত-তারা কোন তারাই নয়। তবে কি?

এক একটা তারা বা নক্ষত্র বড় বড় জ্যোতিষ্ক। কোন কোনটি আকারে শত শত সূর্যের সমান। সকলেই সৌরজগতের মত এক একটি জগৎ তৈরী ক'রে আমাদের পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল

আকাশবাণী (All India Radio)-র কলিকাতা কেন্দ্রে লেখক কর্তৃক 'বিদ্যার্থীদের জন্য' পঠিত হয়।

দূরে অবস্থান করছে। তাই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পৃথিবীর তো কথাই নেই, গ্রহ-সম্রাট সূর্যেরও সাধ্য নেই সুদূরের ওই তারাগুলোর অন্তত একটিকেও সৌরজগতের মধ্যে টেনে নিয়ে আসে। তবে দৈবক্রমে এই অসম্ভবই যদি সম্ভব হতো, সত্যই যদি কোন তারা খ'সে পড়তো পৃথিবীতে, তাহ'লে গোটা পৃথিবী এক নিমিষে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো। আর ওই ভাঙ্গা পৃথিবীর একটা কণাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতো না।

আসলে 'তারা-খসা' ব্যাপারটি হচ্ছে 'উল্কাপাত'। উল্কা (meteor) এক প্রকার জড়পিণ্ড বিশেষ। কোন কোনটি আকারে বালুকণার মত ছোট, কোন কোনটি আবার প্রস্তরখণ্ডের মত বড়। বিজ্ঞানীরা বলেন—পৃথিবীর অনেক উপাদানই উল্কার মধ্যে আছে।

অসংখ্য উল্কা কখনো একা একা, কখনো-বা দল বেঁধে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ায় ; সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ঘুরতে ঘুরতে যে উল্কাগুলো পৃথিবীর খুব কাছে এসে পড়ে, সেগুলো তখন পৃথিবীর টানে ভীষণ বেগে পৃথিবীর দিকেই ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে বায়ুমণ্ডলকে ভেদ করার সময় বায়ুস্তরের সঙ্গে উল্কাদেহের ঘর্ষণ হয়। ঘর্ষণের ফলে উল্কা খুব গরম হয়ে ওঠে এবং আরো পরে তাপ বাড়তে বাড়তে এক সময় ওটি জ্বলে ওঠে। এই জ্বলা-উল্কা দেখেই আমরা 'তারা-খসা' বলি।

জ্বলন্ত উল্কা বাতাসের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর দিকে নামতে না নামতেই পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু যে উল্কা আকারে বেশ একটু বড়, সেটি দগ্ধ অবস্থায় পৃথিবীর গায়ে এসে পড়ে এবং ঠাণ্ডায় জমে যায়। এরকম পোড়া উল্কার টুকরো পৃথিবীর অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে। পৃথিবীর লোকেরা সেগুলো সংগ্রহ ক'রে বিভিন্ন সংগ্রহ-শালায় যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছে। কলকাতার মিউজিয়ামেও ছোট ছোট কয়েক টুকরো উল্কাপিণ্ড আছে।

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী মহামতি নিউটন হিসেব ক'রে বলেছেন, সারা দিন-রাতে প্রায় দু'কোটি উল্কা পৃথিবীর বায়ুস্তরে ঢোকে। এদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি পুড়তে পুড়তে পৃথিবীতে পৌঁছায়। বাকীগুলো

নিচে নামবার সময় পুড়ে ছাই হয়ে আকাশেই অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে উল্কা-ভস্ম আকাশপথে ভাসতে ভাসতে পৃথিবীর গায়ে এসে আস্তে আস্তে জমা হয় ; প্রতি বছর পৃথিবীর ওপর যে পরিমাণ উল্কা-ভস্ম জমা হচ্ছে তা প্রায় তিন হাজার মণ।

রাতের বেলায় উল্কাপাত বা তারা-খসা যা আমরা দেখি, তাতে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হয় না। কারণ অধিকাংশ উল্কাপাত পৃথিবী পর্যন্ত পৌছায় না। আর যদি-বা দু'একটি শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে এসে পড়ে, তাদের দেহের পরিমাণ এতই কম যে, বিরাট পৃথিবীর তাতে কিছুই যায়-আসে না। তবে বিপুল দেহের কোন কোন উল্কা পৃথিবীর গায়ে প'ড়ে বিপর্যয় ঘটিয়াছে—সে নজীরও আছে।

1903 সালের 30শে জুন সাইবেরিয়ার ইর্কুৎস্কের প্রায় হাজার কিলোমিটার উত্তরে তুঙ্গুস বনভূমিতে বড় রকমের এক উল্কাপাত হয়। পতনের সময় এতো উজ্জ্বল ছিলো যে সূর্যের আলোও ম্লান হয়ে যায়। 400 বর্গমাইলের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত গাছপালা জীবজন্তু নিঃশেষ হয়ে যায়। এই উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর গায়ে পড়বার সময় দারুণ একটা বিস্ফোরণ ঘটে। মাটি কেঁপে ওঠে প্রচণ্ড বেগে। কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে যেসব গাছপালা ছিলো নিমিষে তা উপড়ে যায়।

1947 সালের 12ই ফেব্রুয়ারী সকাল 10টা 38 মিনিটে সাইবেরিয়ার সিহতে-আলিন পর্বতে আবার একটি উল্কাপাত হয়। এই উল্কাপাতের ফলে পর্বতের তুষারাবৃত ঢালেও বিরাট গর্ত সৃষ্টি হয়। মেক্সিকো প্রদেশের এরিজোনা নামক জায়গায় বিরাট এক গর্ত আছে। বিজ্ঞানীদের মতে, বহু যুগ আগে খুব বড় উল্কাপিণ্ড পড়েই ওখানে ওরকম গর্ত হয়ে গেছে।

পৃথিবীর নানাজায়গায় যে বড় বড় উল্কাপিণ্ড পাওয়া গেছে তাদের পরিমাণের কথা ভাবলে আমাদের অবাক হতে হয়। সিহতে-আলি- পর্বতের উপর পড়া উল্কাপিণ্ডের কুড়িয়ে-পাওয়া দেহগুলোর ওন মোট 40 টন ছিলো। সব চেয়ে বড় টুকরোটির ওজন ছিলো 17-

কিলোগ্রাম। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন, উল্কাপিণ্ডটির মোট ওজন ছিলো হাজার টন। পড়ে-পাওয়া বড় বড় উল্কাপিণ্ডর মধ্যে ইংলণ্ডের মিউজিয়ামে যেটি রাখা আছে, তার ওজন প্রায় একশো মণ। গ্রীণল্যাণ্ডে এক হাজার মণের এবং মেক্সিকোতে চৌদ্দ হাজার মণের উল্কাপিণ্ডও সংগ্রহ করা আছে।

উল্কাদেহের উপাদান নিয়ে মানুষের গবেষণা শুরু হয়েছে 1772 সালে মাত্র দু'শো বছর আগে। আমাদের অজানা কোন ধাতু উল্কাপিণ্ডে পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে তার বেশীর ভাগ হলো—লোহা, নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম, অক্সিজেন, গন্ধক প্রভৃতি।

শুধু মাত্র বিশুদ্ধ লোহার উল্কাপিণ্ডও পাওয়া গেছে। এজন্য কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, আদিম মানুষ উল্কার লোহা নিয়েই যন্ত্রপাতি তৈরী করতো। সে কথা সত্য হোক বা না-হোক একথা সত্য যে বিশ্বজগতের সমস্ত কঠিন দেহের উপাদান একই।

কিন্তু কিভাবে উল্কাদেহের সৃষ্টি, বিজ্ঞানীদের ধারণা—সৌর-জগতের শৈশবে হয়তো খণ্ডগ্রহ ও ধূমকেতু ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে উল্কাগুলির সৃষ্টি হয়েছিল।

ধূমকেতুর কথা

অনেক পণ্ডিতের মত—উল্কার জন্ম ধূমকেতুর দেহ থেকে। এই ধূমকেতুর জন্ম কিন্তু সৌরজগতে নয়, ওরা বাইরের আগন্তুক মাত্র। তাই সৌরজগতের বাসিন্দা গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে সৌরপতি সূর্যের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ধূমকেতুর সঙ্গে কিন্তু সে সম্পর্ক নয়। এরা অকস্মাৎ কোন অজানা দেশ থেকে ছুটে এসে সূর্যের রাজ্যে ঢুকে পড়ে এবং কয়েকদিন অথবা কিছুক্ষণের জন্য এ রাজ্যের অতিথি হয় মাত্র।

অল্প সময়ের জন্য সৌরজগতে থাকার ফলে কোন কোন ধূমকেতু সূর্য বা বড় বড় গ্রহদের মায়ার বাঁধনে আটকে পড়ে। গ্রহগুলো অতিথি ধূমকেতুদের অনেককেই চিরকালের জন্য বেঁধে রেখেছে।

বাঁধা থাকে মানে এরা চুপচাপ ক'রে শুধু বসে থাকে না ; এরা সারা-জীবন ধ'রে একই সময় নিয়ে একই পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে ; ঠিক যেমন গ্রহগুলি সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে।

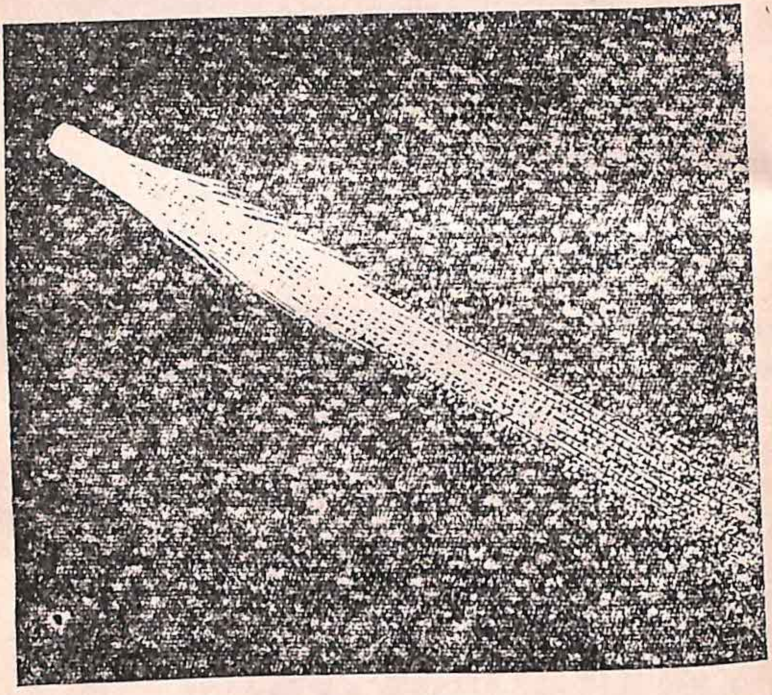
যে যে অতিথি ধূমকেতু সূর্য বা কোন গ্রহের টানকে এড়িয়ে কোন রকমে একবার সৌরজগতের গণ্ডীর বাইরে যেতে পারে তারা চিরদিন পালিয়েই থাকে। এই পলাতক ধূমকেতুগুলির আগামী-কালের কোনদিনই সৌরজগতে ফিরে আসবার সম্ভাবনা নেই—এই কথাই বিজ্ঞানীরা বলেন।

তাঁরা আরও বলেন—বন্দী ও পলাতক উভয় শ্রেণীর ধূমকেতুর ভ্রমণ-পথ পৃথক। বন্দী ধূমকেতু উপবৃত্তাকার (elliptic) পথে এবং পলাতক ধূমকেতু অধিবৃত্তাকার (parabolic) অথবা পরাবৃত্তাকার (hyperbolic) পথে ভ্রমণ করে। অধিবৃত্তাকার বা পরাবৃত্তাকার পথের দু'দিক যতই বাড়ানো যাক না কেন, কোথাও তারা স্পর্শ করে না। এবং এজন্যই এ পথের যাত্রী ধূমকেতুর কোনদিনই আর ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যারা উপবৃত্ত পথের ভ্রমণকারী তারা আবার ফিরে আসে সত্য, তবে ফিরতে বহু বছর কেটে যায়। কারণ, গ্রহদের ভ্রমণ-পথ থেকে এদের ভ্রমণ-পথ আরো অনেক বড়।

বৃহস্পতি একাই গোটা তিরিশ ধূমকেতুর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তেমনি শনির প্রভাবে দু'টি, নেপচুনের প্রভাবে ছ'টি এবং ইউরেনাসের প্রভাবে তিনটি ধূমকেতু চিরকালের জন্য সৌরজগতে বন্দী হয়ে আছে। এরা সকলেই নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এদের মধ্যে যেটি খুব বিখ্যাত, সেটির নাম 'হ্যালির ধূমকেতু'। এটি নেপচুনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। জ্যোতির্বিদ্ হ্যালি সাহেব স্বচক্ষে এটি দেখেছেন এবং নানা গণনা ক'রে এর সম্পর্কে অনেক তথ্য আমাদের দিয়ে গেছেন। এই জন্যই এটিকে তাঁর নাম-অনুসারে 'হ্যালির ধূমকেতু' বলা হয়।

হ্যালি সাহেব এটি দেখেন 1682 সালে। এরও আগে 1607

সালে বিজ্ঞানী কেপলার এবং আরো আগে 1531 সালে বিজ্ঞানী অপিনাস একে দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁরা তখন জানতেন না, একই ধূমকেতু প্রায় একই সময় পর ফিরে ফিরে আসছে। একথা সবার আগে ব'লে গেলেন বিজ্ঞানী হ্যালি। আগের বিজ্ঞানীদের লিপিবদ্ধ সত্যের উপর ভিত্তি ক'রে এবং 1682 সালের নিজের চোখে



একটি ধূমকেতু ও তার পুচ্ছ

ধূমকেতুটিকে দেখে তিনি বললেন, 1757 বা 1753 সালে আবার এটি দেখা যাবে। পরে তিনি মারা গেলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর 1757 সালের শেষের দিকে সারা বিশ্ব অবাক হয়ে দেখলো, হ্যালি সাহেবের ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। 75 বছর পরে 'হ্যালির ধূমকেতু' আবার ফিরে এলো। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে 1910 সালে এটি দেখা গিয়েছিল এবং আমরা যারা তখনও বেঁচে থাকবো তারা 1985 বা 1986 সালে একে দেখতে পাবো।

কিন্তু 1985 অথবা 86 সালে এই ধূমকেতুকে যদি দেখতে না পাই অর্থাৎ এটা যদি আর ফিরে না আসে তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ নানা কারণেই ধূমকেতুর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। চলার পথে দৈবাৎ কোন বড় গ্রহের নিকটবর্তী হলে ধূমকেতুটি সেই বড় গ্রহের আকর্ষণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে পারে, তার গতিপথ পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন, ব্রুকসের ধূমকেতুর 27 বছর অন্তর ফিরে ফিরে আসতো। 1886 সালে এই ধূমকেতুটি হঠাৎ বৃহস্পতি গ্রহের খুব কাছ দিয়ে চলে যায়। ফলে 27 বছরের পরিবর্তে এর পরিক্রমন কাল হয় 7 বছর।

ধূমকেতুর দেহ খুব পাতলা বায়বীয় বস্তু দিয়ে তৈরী। এর দেহের উপাদান সূর্যের আলো রোধ করতে পারে না। তাই কোন ধূমকেতু কোন সময় সূর্যকে ঢেকে রাখলেও সূর্য-গ্রহণ হয় না।

ধূমকেতু দেখতে অনেকটা ঝাঁটার মত। সামনের দিকে ওর মাথা; পিছনের দিক পুচ্ছ। প্রথমে ওর কোন পুচ্ছ থাকে না। ধূমকেতু সূর্যের দিকে আসতে থাকলেই ওর পুচ্ছ গজিয়ে ওঠে। সূর্যের যত কাছে আসে পুচ্ছের দৈর্ঘ্য ততই বেড়ে যায়।

ধূমকেতুর দেহের কণাগুলি পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে তাপ ও আলো তৈরী করে। তাই ধূমকেতুর নিজের আলোতেই ওকে উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু নক্ষত্রদের আলোর তুলনায় এই আলো এতই ক্ষীণ যে ওরা একটু বেশীদূরে থাকলে ওদের দেহ দেখা যায় না।

সৌরজগতের বাইরে চলে যাওয়ার সময় ওদের পুচ্ছের সবটুকু গুটিয়ে নিতে পারে না। কতকটা মহাশূন্যের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকে। এবং এ থেকেই উল্কাপিণ্ডের জন্ম হয়। অন্তত এটাই অনুমান করা হয়েছে। তবে উল্কা ও ধূমকেতুর উৎপত্তি বিষয়ে এর থেকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা কখনও বিজ্ঞানীরা দিতে পারেন নি।

উপগ্রহ চাঁদ

চাঁদ। ছোট্ট একটি কথা। অথচ পৃথিবীর কোটি কোটি শিশুর মনে কত বিস্ময় জাগায় ওই ছোট্ট চাঁদ। চাঁদ থাকে কোন্ দূর আকাশে। শিশু থাকে মায়ের কোলে। কিন্তু তার চোখের চাহনি ছুটে যায় ওই চাঁদের কাছে। ছোট্ট শিশু আর ছোট্ট চাঁদ অথচ দু'জনের মাঝে কত লুকোচুরি খেলা চলে। শিশুর মতই চাঁদ সুন্দর। শিশুর মতই চাঁদের মুখের হাসি স্নিগ্ধ, তাই তো মানুষ সব কিছু ভুলে যায় চাঁদ দেখে।

এই চাঁদকে নিয়ে কত যুগ ধ'রে কবিরা কত কবিতা লিখেছেন। কত লোক কত পূজা করেছেন এই চাঁদের। পুরাকালে সূর্যের মত চাঁদও ছিল দেবতা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানেন—চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। পৃথিবীর দেহ থেকেই একদিন চাঁদের জন্ম হয়েছিল। চাঁদকেই ভব্য কথায় 'চন্দ্র' বলে।

পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে কিন্তু চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। পৃথিবীর পাশে পাশে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদও সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

পৃথিবীর মত চাঁদও নিজের চারদিকে নিজেও ঘুরপাক খাচ্ছে। পৃথিবীকে পাক খেতে চাঁদের সময় লাগে সাড়ে উনত্রিশ পৃথিবী-দিন।

চাঁদ আকারে সূর্যের মত দেখতে। অথচ চাঁদ সূর্য থেকে অনেক ছোট। সূর্যের তের লক্ষ ভাগের এক ভাগ হলো পৃথিবী। সেই পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ চাঁদ। তাহলে বিরাট সূর্যের তুলনায় চাঁদ কত ছোট। প্রায় সড়ে ছ'কোটি চাঁদকে সূর্যের ভিতর পুরে রাখা চলে। তবুও আমরা চাঁদ দেখে এটা বুঝতে পরি না।

কারণ পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব দু'লক্ষ আটত্রিশ হাজার মাইল বা তিন লক্ষ চুরাশি হাজার কিলোমিটার। একটি উড়োজাহাজ ঘণ্টায় 300 মাইল বেগে চললে সূর্যে পৌঁছুতে সময় লাগবে 35 বছর; আর চাঁদে মাত্র 33 দিন। হাজার কিলোমিটার গতিতে উড়োজাহাজ



পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদও সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

নিয়ে গেলে চাঁদে পৌঁছুতে মাত্র 16 দিন লাগবে। চাঁদ পর্যন্ত যদি একটা হাঁটাপথ কল্পনা করা যায়, আর আমরা যদি কেউ না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে ঘণ্টায় 4 মাইল বেগে হাঁটতে পারি তাহলে চাঁদে পৌঁছুতে সময় লাগবে মাত্র 6 মাস।

চাঁদে পৌঁছবার আগেই মানুষ জানতো-চাঁদে না আছে জল, না আছে বাতাস। পৃথিবীর মত মাটিও নেই সেখানে। চাঁদের একদিক উত্তপ্ত, আর একদিক হিম-শীতল জমাট পাথর। চাঁদের যে দিকে দিন সে-দিকে ফুটন্ত জলের চেয়েও বেশী তাপ। আর যে দিকে রাত সে-দিকে ঠাণ্ডা বরফের চেয়েও বেশী।

মজাও কিন্তু কম হবে না চাঁদের দেশে। পৃথিবীর তুলনায় চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনেক কম; ছ'ভাগের এক ভাগ মাত্র। কাজেই সেখানে কোন রকমে একবার পৌঁছুতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ওজন কমে যাবে। কারুর ওজন যদি পৃথিবীতে ষাট কিলোগ্রাম হয় তবে চাঁদে হবে দশ কিলোগ্রাম। আমরা পৃথিবীতে যত ওজনের জিনিস বইতে পারি, চাঁদে পারবো তার ছ'গুণ বেশী। এমনি সুবিধে হবে আমরা যখন লাফাবো সেখানে। অতি সহজেই আমরা বড় বড় নালা এমনকি ছোট-খাটো নদী পর্যন্ত ডিঙ্গুতে পারবো। কারণ,

একেতো মাধ্যাকর্ষণ ছ'গুণ কম, তার উপর বাতাসের বাধাও নেই সেখানে। তখন কী মজাই না হবে!

চাঁদ দেখতে উজ্জ্বল হলেও ওর কিন্তু নিজের আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদের গায়ে পড়ে। তাই চাঁদকে দেখা যায়। নইলে আমরা তো চাঁদকে দেখতেই পেতাম না। কিন্তু চাঁদের দেহ যদি খুব মসৃণ হতো তাহলে তো চাঁদের দিকে চাওয়াই যেতো না। চাঁদের দেহ অমসৃণ বলে সূর্য থেকে আসা সব আলো ওর গায়ে প্রতিফলিত হতে পারে না। খানিকটা আলো অমসৃণ দেহ শুষে নেয়, খানিকটা আমাদের চোখে আসে। অল্পমাত্র আলোতেই চাঁদ জ্বল জ্বল করে। পূর্ণিমার রাতে আলোয় আলোময় ক'রে দেয় চারদিক। চাঁদের এই ঔজ্জ্বল্য সূর্যের তুলনায় চার লক্ষ সাইত্রিশ হাজার গুণ কম।

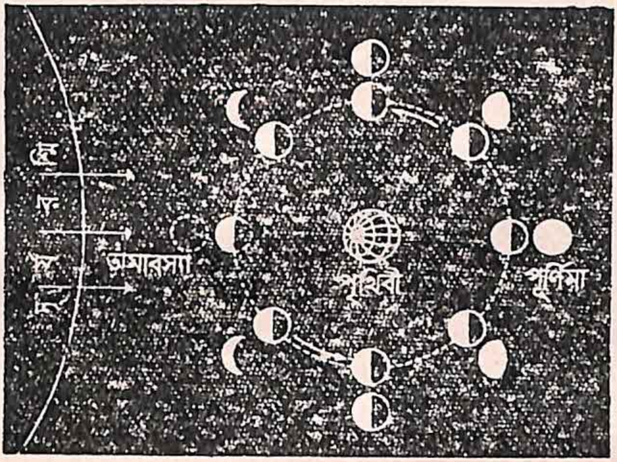
চাঁদের আলো : প্রতিদিন চাঁদকে আমরা একই রকমে দেখি না। এক এক দিন তার এক এক আকার। কোনদিন কাস্তের মত ফালি, কোনদিন থালার মত গোল, আবার কোনদিন যেন আধখানা থালা।

চাঁদ ওঠে কোনদিন ঠিক সন্ধ্যেয়, কোনদিন একটু রাত হলে, কোনদিন আবার রাত দুপুরে বা ভোর রাতে।

সূর্যের মত চাঁদ কিন্তু রোজ সন্ধ্যের আগে পূর্বদিকে ওঠে না। কোনদিন পুব আকাশে, কোনদিন মাথার ওপর, কোনদিন আবার পশ্চিম আকাশেই উঠতে দেখি।

আবার মাসের মধ্যে অন্তত এমন এক রাত আসে, যেদিন চাঁদকে সারা আকাশের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সেদিন অমাবস্যা। অমাবস্যার রাত ঘন অন্ধকার। এক অমবস্যার ঠিক 15 দিন পর থালার মত বড় চাঁদ গোল হয়ে পুব আকাশের গোড়া থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরোয়। সেদিন 'পূর্ণিমা' রাত। ঝকঝকে আলোয় আলোময়। পূর্ণিমার 15 দিন পর আবার অমাবস্যা। এইভাবে 15 দিন অন্তর অন্তর অমাবস্যা আর পূর্ণিমা যাওয়া আসা করে।

অমাবস্যার পরের রাতে সরু কাস্তের মত এক ফালি চাঁদ আকাশে দেখা যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটা উধাও হয়। পরের দিন একটু বড় হয়ে চাঁদ ওঠে, আর একটু বেশী লাত থাকে।



চাঁদের কলা

এমনিভাবে বড় হতে হতে পূর্ণিমার দিন সবচেয়ে বড় হয়। তখন চাঁদ একেবারে গোল। সারারাত সেদিন আকাশে থাকে। ঠিক এর পরের দিন থেকে চাঁদ আবার ছোট হতে শুরু করে। ওঠেও একটু একটু দেরাতে। এমনি ক'রে ছোট হতে হতে অমাবস্যার দিন একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যায়। চাঁদের এই নিয়মিত হ্রাস ও বৃদ্ধিকে 'চাঁদের কলা' বলে। কিন্তু সত্যি সত্যি চাঁদ কমেও না, বাড়েও না। সূর্যের দ্বারা আলোকিত অংশের যতটুকু আমাদের সামনে থাকে, আমরা তখন ততটুকুই দেখি। অমাবস্যার চাঁদের আমাদের দিকের অংশে কোথাও সূর্যের আলো পড়ে না। আবার পূর্ণিমার চাঁদের যে-অংশ আমাদের দিকে থাকে তার সবটাই সূর্যের আলোয় আলোময়।

পৃথিবীর মানুষ চাঁদে গিয়ে দেখবে চাঁদের আকাশে পৃথিবীর কলা'। পৃথিবীতে যেমন চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখি, তেমনি চাঁদে দেখা যাবে—পৃথিবীর হ্রাসবৃদ্ধি। সেখানেও অমাবস্যা আর পূর্ণিমা

হচ্ছে। তবে তফাৎ আছে। পৃথিবীতে যখন অমাবস্যা, চাঁদে তখন পূর্ণিমা। আবার পৃথিবীতে যখন পূর্ণিমা, চাঁদে তখন অমাবস্যা। তাছাড়া চাঁদের আকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখলে চাঁদ থেকে আরো 40 গুণ বেশী উজ্জ্বল দেখাবে। তার কারণ চাঁদের দেহ যে পরিমাণ সূর্যের আলো প্রতিফলিত করতে পারে, তার থেকে আরো ছ'গুণ বেশী আলো প্রতিফলিত করবে পৃথিবীর দেহ। উপরন্তু পৃথিবীকে চাঁদের চেয়ে আয়তনে 15 গুণ বড়ও মনে হবে।

দিনের বেলাতেও চাঁদের আকাশ কালো কুচকুচে। পৃথিবীর মত নীল আকাশ সেখানে নেই। কারণ চাঁদে বাতাস নেই। বাতাসের ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসে ব'লেই পৃথিবীর আকাশকে আমরা 'নীল' দেখি।

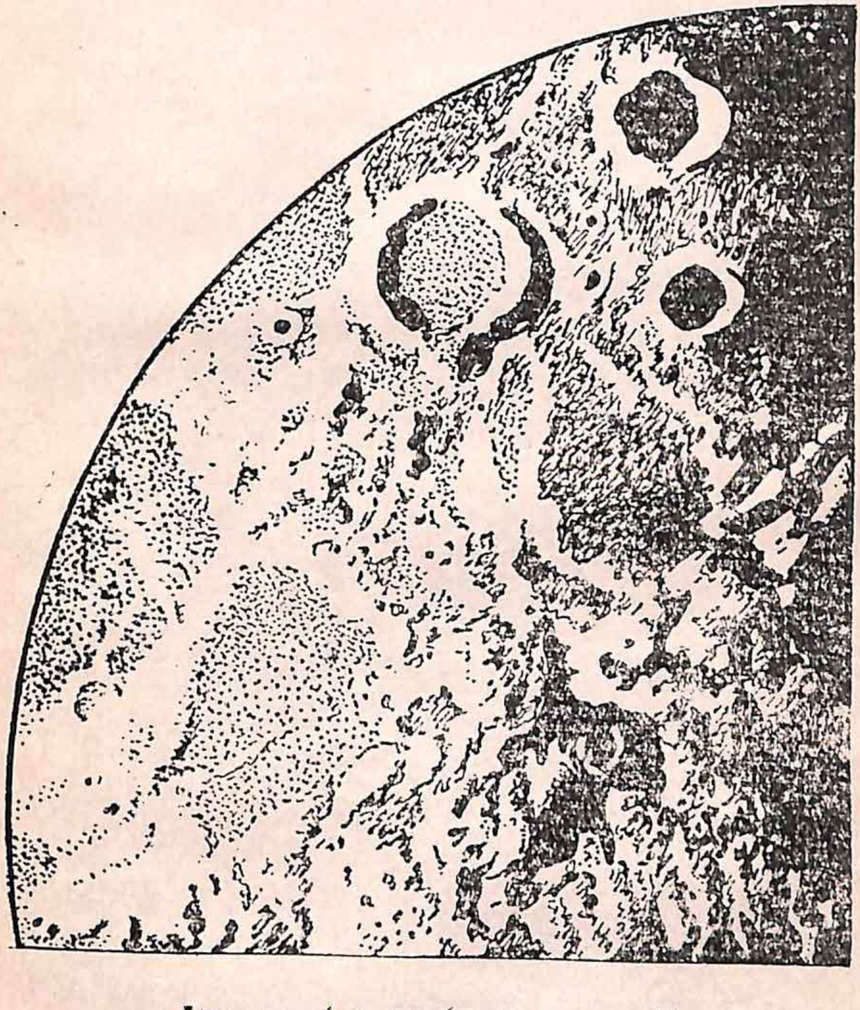
তবে একটা কথা—দিনের বেলাতেও চাঁদের কালো আকাশে অসংখ্য তারা ফুটে থাকে। সূর্যালোক তারাদের অস্পষ্ট করতে পারে না। এমন কি সূর্যের কাছের তারাগুলোও সেখানে দেখা দেয়। এর কারণ চাঁদের দেহের উপর বায়ু নেই।

পৃথিবীতে বায়ুকণা সূর্যের আলোতে দীপ্ত হয়ে তারাদের আলো ঝাপসা ক'রে দেয়। এ জন্য দিনের বেলায় পৃথিবীতে তারাদের পাত্তা পাওয়া যায় না। কিন্তু চাঁদে তো বাধা দেওয়ার মত কিছুই নেই। তাই সূর্যের প্রখর রশ্মিতে তারাদের সব চেয়ে অপ্রখর রশ্মিও দেখা যায়।

চাঁদ দেখতে সাদা ধপধপে হলেও ওর গায়ে কতকগুলো কালো কালো দাগ আছে। এগুলোকে 'চাঁদের কলঙ্ক' বলে। চাঁদের যেখানে বড় বড় গর্ত আছে, সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছে না। তাই সেখানে অন্ধকার। পৃথিবী থেকে সেই সব জায়গা আমরা কালো কালো দাগের মত দেখি।

আসলে এগুলো বড় বড় খাদ বা গহ্বর। এই সব খাদ বা গহ্বর সম্পর্কে নিশ্চিত রূপে জানা গিয়েছে গ্যালিলিও কর্তৃক দূরবীন আবিষ্কারের পর।

চাঁদের যে-অংশ আমরা দেখতে পাই তার প্রায় ষাট ভাগ জায়গা জুড়ে তিন হাজারের মত এই সব খাদ রয়েছে। খাদগুলোর উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানী-মহলে মতভেদ আছে।



চাঁদের কলঙ্ক (পাহাড়-পর্বত আর বড় বড় গর্ত)

[ছবিতে চাঁদের এক-চতুর্থাংশ দেখা যাচ্ছে]

গ্যালিলিওর মতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই খাদগুলোর সৃষ্টি। 1873 খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক প্রক্টোর বলেন, উল্কাপিণ্ডের পতনের জন্য চাঁদের দেহে জায়গায় জায়গায় গর্ত বা খাদ হয়ে গেছে। বুলগেরিয়ার

বৈজ্ঞানিক বোনেকের মত, খাদগুলো সৃষ্টি হয়েছে চাঁদের প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণের জন্যে। এমনি ধারা অনেক মত আছে এ সম্পর্কে। বিভিন্ন দেশে এ নিয়ে গবেষণা চলছে। অদূর ভবিষ্যতে আমরা তার ফলাফল জানতে পারবো।

রাতের আকাশে যখন সূর্য থাকে না, তখন আলোর বন্যা বয়ে আনে চাঁদ। হোক-না সে-আলো সূর্য থেকে ধার করা—তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। চাঁদই আমাদের রাতের সূর্য। আবার চাঁদের আকর্ষণেই সাগরের জলে জোয়ার-ভাঁটা হয়। জোয়ারে সাগরের জল ফুলে ফেঁপে নদীর মোহনা দিয়ে ভিতরে ঢোকে। ফলে বড় বড় জাহাজ নদী-পথে দেশের মধ্যে আসতে পারে; ভাঁটার টানে সেই জাহাজগুলো সহজেই আবার সাগরের জলে ফিরে যায়। এতে মানুষের কত সুবিধে হয়!

সূর্যগ্রহণ: ছোটবেলায় গ্রহণ সম্পর্কে আমরা অনেক গল্পই শুনেছি। শুনেছি রাহু নামে এক দৈত্যের কাছে চন্দ্র সূর্য উভয়েই ঋণী। তারা এখনও সে-ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি। তাই রাহু তাদের মাঝে মাঝে গ্রাস করে। ফলে গ্রহণ হয়। কিন্তু আমরা সে-কথা এখন ভুলে যাবো। কারণ, সূর্য-গ্রহণ আর চন্দ্র-গ্রহণ আসলে আলো-আধারের খেলামাত্র।

মনে প্রশ্ন হতে পারে, অতটুকু চাঁদ অত বড় সূর্যকে—সূর্য গ্রহণের সময় ঢেকে দেয় কি ক'রে?

মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখের সামনে একটা হাত তুললে দূরের গাছ-পালা বাড়ী-ঘর অনেক কিছুই দেখা যায় না। ছোট একখানি হাত দূরের কত বড় বড় জিনিসকে চোখের আড়াল ক'রে দেয়। সূর্য-গ্রহণ কতকটা এই রকম ব্যাপার। চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এমনি ঘুরতে ঘুরতে প্রতি অমাবস্যায় সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চাঁদ এসে পড়ে। কোন কোন অমাবস্যার দিন চন্দ্র পৃথিবীর কোন অংশের লোকেদের চোখ থেকে গোটা সূর্যকে অথবা ওর খানিকটা অংশকে কিছুক্ষণের জন্য আড়াল করে রাখে। তাই পৃথিবীর সেই

অংশের লোকের কাছে তখন 'সূর্যগ্রহণ'। লোকের চোখে গোটা সূর্য আড়াল হলে 'পূর্ণগ্রাস সূর্য-গ্রহণ' আর সূর্য-দেহের কিছুটা আড়াল হলে 'আংশিক' বা 'খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ' বলে।

অনেক সময় আরও একরকম সূর্য-গ্রহণ দেখা যায়। একে বলে 'বলয়-গ্রাস সূর্য-গ্রহণ'। পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবার সময় চন্দ্র থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সব সময় ঠিক থাকে না। কোন এক সূর্য-গ্রহণের সময় পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব যদি খুব বেশী হয়, তাহলে পৃথিবীর কোন অংশের লোকেরা সূর্যের মাঝখানটুকু শুধু দেখতে পায় না। তখন ওর দেহের চারপাশ 'বালার' (রিং) আকারে দেখা যায়। এজন্য তখন 'বলয়-গ্রাস সূর্য-গ্রহণ' হয়। বলয়-গ্রাসের সময় পৃথিবী থেকে সূর্যকে চাঁদের তুলনায় ছোট দেখায়। এবং এইজন্যই 'বলয়-গ্রাস সূর্য-গ্রহণ' হয়।

চন্দ্রগ্রহণ ঃ যে বস্তুর ভিতর দিয়ে আলো যেতে পারে না সেরকম কোন বস্তু আলোর সামনে ধরলে আলোর বিপরীত দিকে একটা ছায়া পড়ে। যদি সেই ছায়ার মধ্যে অন্য কোন বস্তু থাকে, তবে তাকে ভালভাবে দেখা যায় না। চন্দ্র-গ্রহণ কতকটা এই রকম ঘটনা। চাঁদ ঘুরতে ঘুরতে প্রতি পূর্ণিমায় পৃথিবীর যে-দিকে সূর্য আছে তার বিপরীত দিকে এসে পড়ে। যে পূর্ণিমায় সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদ একই সরলরেখায় থাকে সেই পূর্ণিমায় পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে। ফলে পৃথিবীর কোন অংশের লোকেরা গোটা চাঁদ অথবা তার দেহের কিছু অংশ দেখতে পায় না। তখন সেই অংশের লোকের কাছে চন্দ্রগ্রহণ হয়। গোটা চাঁদ দেখা না গেলে 'পূর্ণগ্রাস' আর কিছু অংশ দেখা না গেলে 'খণ্ডগ্রাস' চন্দ্রগ্রহণ বলে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার—সব অমাবস্যায় সূর্য-গ্রহণ আর সব পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কারণ সব অমাবস্যায়—সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী আর সব পূর্ণিমায়—সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র একই সরলরেখায় থাকে না।

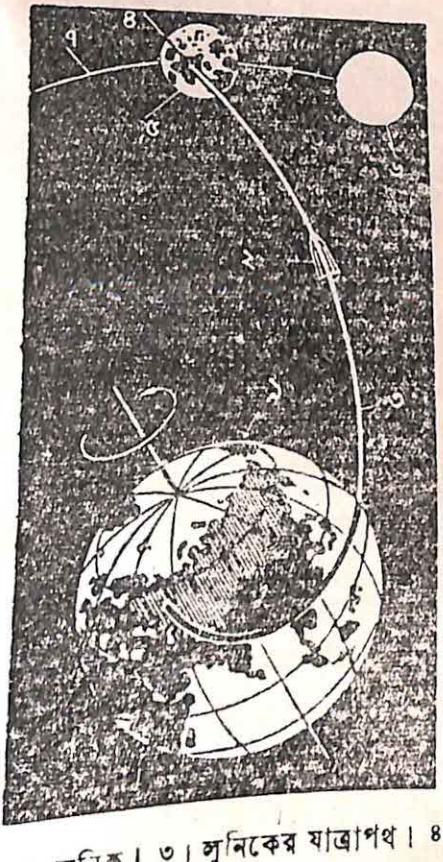
ছোটবেলায় আমরা দেখেছি, গ্রহণের সময়ে অনেকে ভয় পায়! মনে করে, পৃথিবীতে বুঝি বিপদ ঘটবে! কারণ গ্রহণ অমঙ্গলের

প্রতীক। আসলে কিন্তু ও রকম মনে করার কোন হেতু নেই। মানুষের ইতিহাসে কত শত গ্রহণ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত অঘটন তো কোনদিন ঘটেনি।

গ্রহণ কোন অমঙ্গলের চিহ্ন নয়; গ্রহণের সময় কোন অঘটন ঘটে না। তবে পৃথিবীর কোন জায়গায় যখন পূর্ণগ্রাস সূর্য-গ্রহণ হয় তখন শুধু ক্ষণিকের জন্য সূর্যদেব অদৃশ্য হয়ে যায়। ফলে দিনের বেলাতেই রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসে আর সারা আকাশ ছেয়ে যায় কোটি কোটি তারায়।

এক জায়গায় দু'বার পূর্ণগ্রাস অতি বিরল।

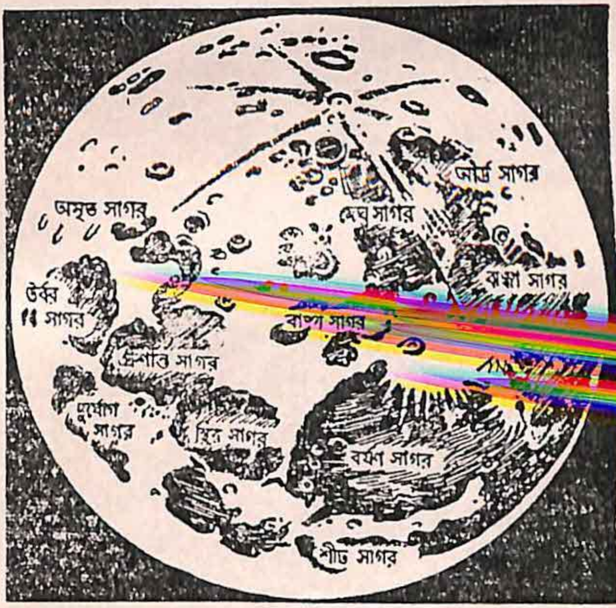
প্রচণ্ড ধূলোর ঝড় উড়িয়ে রুশ রকেট '২য় লুনিক' চাঁদের পিঠে



১। পৃথিবী। ২। লুনিক। ৩। লুনিকের যাত্রাপথ। ৪। চাঁদের মাটিতে লুনিকের আছড়ে-পড়ার এলাকা। ৫। লুনিক আছড়ে পড়ার সময়ে চাঁদের অবস্থান। ৬। লুনিকের যাত্রা-সুরুর সময়ে চাঁদের অবস্থান। ৭। চাঁদের কক্ষ।

আঘাত করলো এই মাত্র সেদিন। আগে থেকে জানা ছিল, চাঁদের পিঠে ধূলো দিয়ে ঢাকা। ২য় লুনিকের আঘাতে ওখান থেকে ধুলোর ঝড় ওঠাতে সে-জানা কথা আরও একবার জানা গেল।

ধূলোর আবরণে ঢাকা রয়েছে চাঁদের অসংখ্য বড় বড় পাহাড়। আর রয়েছে বড় বড় সাগর, উপসাগর। সাগরগুলোর মধ্যে বিখ্যাত চারটি—বর্ষণ সাগর, প্রশান্ত সাগর, বাষ্প সাগর আর মেঘ সাগর। চাঁদের গায়ে সেই কালো দাগ, যাদের আমরা চাঁদের কলঙ্ক বলি,



২য় লুনিক এসে পড়েছে প্রশান্ত সাগর আর বাষ্প সাগরের কাছাকাছি।

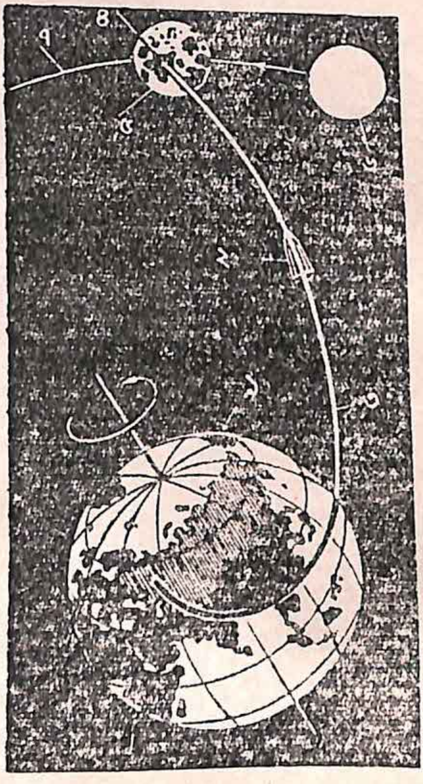
সেগুলো আসলে এইসব সাগরের চিহ্ন। ২য় লুনিক এসে পড়েছে প্রশান্ত সাগর আর বাষ্প সাগরের মাঝামাঝি জায়গায়। আসলে কিন্তু সত্যি সত্যিই চাঁদে কোনদিন সাগর বা ওই জাতীয় কিছু ছিল না। ওগুলো আগের দিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কল্পনার সাগর।

প্রতীক। আসলে কিন্তু ও রকম মনে করার কোন হেতু নেই। মানুষের ইতিহাসে কত শত গ্রহণ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত অঘটন তো কোনদিন ঘটেনি।

গ্রহণ কোন অমঙ্গলের চিহ্ন নয়; গ্রহণের সময় কোন অঘটন ঘটে না। তবে পৃথিবীর কোন জায়গায় যখন পূর্ণগ্রাস সূর্য-গ্রহণ হয় তখন শুধু ক্ষণিকের জন্য সূর্যদেব অদৃশ্য হয়ে যায়। ফলে দিনের বেলাতেই রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসে আর সারা আকাশ ছেয়ে যায় কোটি কোটি তারায়।

এক জায়গায় দু'বার পূর্ণগ্রাস অতি বিরল।

প্রচণ্ড ধূলোর ঝড় উড়িয়ে রুশ রকেট '২য় লুনিক' চাঁদের পিঠে



১। পৃথিবী। ২। লুনিক। ৩। লুনিকের যাত্রাপথ। ৪। চাঁদের মাটিতে লুনিকের আছড়ে-পড়ার এলাকা। ৫। লুনিক আছড়ে পড়ার সময়ে চাঁদের অবস্থান। ৬। লুনিকের যাত্রা-সুরুর সময়ে চাঁদের অবস্থান। ৭। চাঁদের কক্ষ।

আঘাত করলো এই মাত্র সেদিন। আগে থেকে জানা ছিল, চাঁদের পিঠে ধূলো দিয়ে ঢাকা। ২য় লুনিকের আঘাতে ওখান থেকে ধুলোর ঝড় ওঠাতে সে-জানা কথা আরও একবার জানা গেল।

ধূলোর আবরণে ঢাকা রয়েছে চাঁদের অসংখ্য বড় বড় পাহাড়। আর রয়েছে বড় বড় সাগর, উপসাগর। সাগরগুলোর মধ্যে বিখ্যাত চারটি—বর্ষণ সাগর, প্রশান্ত সাগর, বাষ্প সাগর আর মেঘ সাগর। চাঁদের গায়ে সেই কালো দাগ, যাদের আমরা চাঁদের কলঙ্ক বলি,



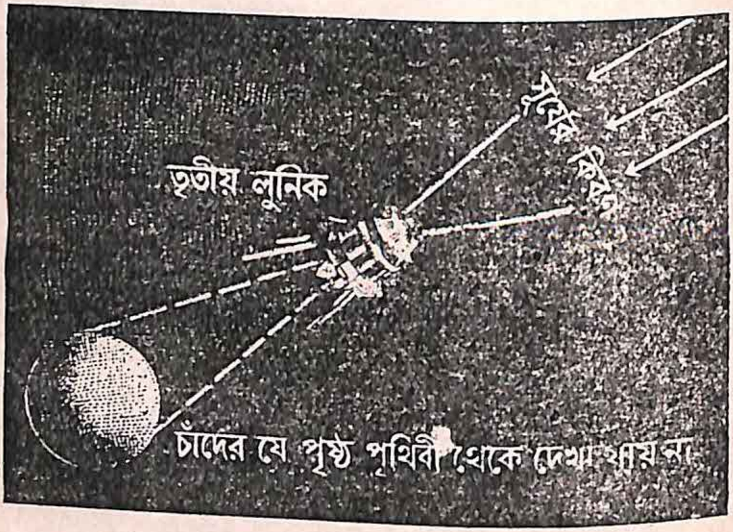
২য় লুনিক এসে পড়েছে প্রশান্ত সাগর আর বাষ্প সাগরের কাছাকাছি।

সেগুলো আসলে এইসব সাগরের চিহ্ন। ২য় লুনিক এসে পড়েছে প্রশান্ত সাগর আর বাষ্প সাগরের মাঝামাঝি জায়গায়। আসলে কিন্তু সত্যি সত্যিই চাঁদে কোনদিন সাগর বা ওই জাতীয় কিছু ছিল না। ওগুলো আগের দিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কল্পনার সাগর।

চাঁদের আধখানা আমরা দেখতে পাই। বাকী আধখানা আমাদের অদেখা।

কিন্তু বাকী আধখানা অদেখা কেন ?

কারণ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের যতটুকু সময় লাগে, ঠিক ততটুকু সময়ে চাঁদ আপন মেরুদণ্ডের উপর এক পাক খায়। ব্যাপারটা তাহলে বুঝিয়ে বলি।



৩য় লুনিক যে ভাবে চাঁদের অদেখা অংশের ফটো তুলেছে।

একটা বল নেওয়া হলো। ওর আধখানা কালো রঙ আর আধখানা সাদা রঙ মাখানো। এখন টেবিলের উপর আর একটা বল রেখে ওর পাশে পাশে প্রথম বলটি এমন ভাবে ঘোরাতে হবে যেন ওর সাদা দিকটা সর্বদাই দ্বিতীয় বলটির দিকে থাকে। দেখা যাবে দ্বিতীয় বলটিকে একবার ঘুরে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বলটিও নিজের চারদিকে এক পাক খেয়েছে। ঠিক সেই ব্যাপার ঘটে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করার সময়।

আসলে আমাদের কাছে যেটা 'চন্দ্র মাস' চাঁদের মানুষের কাছে সেটা 'চন্দ্র দিন', অবশ্য চাঁদে যদি মানুষ থাকে। চাঁদের দিন আর রাতের সময় হলো সাড়ে উনত্রিশ পৃথিবীর দিন রাতের সমান। তার

মানে চাঁদের একটা দিন রাত হলো ৭০৮ ঘণ্টা। শুধু দিন ৩৫৪ ঘণ্টা, শুধু রাত ৩৫৪ ঘণ্টা।

সম্প্রতি রুশ রকেট '৩য় লুনিক' সেই অদেখা অংশের ফটো তুলেছে। এই ফটো নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। বর্তমান জগতের বিজ্ঞানীদের কাছে আমরা আশা করছি, খুব শিগ্‌গির তাঁরা চাঁদে মানুষ পাঠাতে পারবেন।

মহাশূন্যের রহস্য

দিনের বেলা। আলোয় ঝলমল করে চারদিক। কোন্ সকাল থেকেই সূর্য তাপ আর আলো বিলাতে শুরু করেছে। মাথার উপরে কোথাও এতটুকু মেঘ নেই। উপরটা যেন নীল চাঁদোয়া দিয়ে ঘেরা। কি বিরাট এই চাঁদোয়া। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। চারদিকে যেন মাটি ছুঁয়ে আছে। কিন্তু আমরা যদি উপরে উঠতে থাকি, তবে কি ওই চাঁদোয়া ধরতে পারবো ?

না, যত উপরেই উঠি না কেন, কোনদিনই ওটি আমাদের মাথায় ঠেকবে না। কারণ, আসলে কোথাও কিছু নেই। সবই ফাঁকা ; চোখের ভুল। ওই 'ফাঁকাই' আকাশ। সূর্যের আলো বায়ুর ভিতর দিয়ে এসে আমাদের চোখে যখন পড়ছে তখনই আমরা মনে করি উপরের ওই ফাঁকা জায়গা নীল চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা। যদি সূর্যের আলো না-আসতো, তবে 'নীল আকাশ' বলে কিছুই আমরা দেখতাম না। আবার, পৃথিবীর উপরে বাতাসের স্তর না থাকলেও ওই নীল আকাশকে আমরা দেখতাম কালো কুচকুচে। চাঁদে বায়ু নেই ব'লেই তো চাঁদের আকাশ পৃথিবীর মত নীল নয়।

পৃথিবীর আকাশ নীলই হোক অথবা সকাল-সন্ধ্যেয় ওই নীল আকাশকে আমরা লালচেই দেখি, আসলে কোথাও তো কিছু নেই। সবই ফাঁকা ; সবই শূন্য। শূন্য মানে অঙ্কের বই-এর গোল্লার মত শূন্য নয়। এখানে শূন্য মানে কিছুই না। শুধুই ফাঁকা। ফাঁকাই শূন্য।

এই শূন্যের পরিমাণ এতই বিরাট যে আমরা শূন্যকে শুধু শূন্য না ব'লে 'মহাশূন্য' বলবো।

নীহারিকা ও ছায়াপথ

মহাশূন্যে রয়েছে গ্রহ-উপগ্রহ, গ্রহকণিকা আর কোটি কোটি নক্ষত্র। কিন্তু খুব শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে দেখলে রাতের আকাশে সাদা ঘন মেঘের মত আরো একরকম জ্যোতিষ্ক দেখা যায়। এদের নাম 'নীহারিকা'।

আরো দেখা যায়—'ছায়াপথ'। চূর্ণ-চূর্ণ আলো দিয়ে তৈরী ছায়াপথ; ছড়িয়ে থাকে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। ছায়াপথ যেন নদীর সাদা জল, বয়ে চলেছে দিক থেকে দিগন্তে। অসংখ্য নক্ষত্র মিলে এই ছায়াপথের সৃষ্টি।

কিন্তু আসলে আমরা ছায়াপথের আধখানা দেখি। পৃথিবীর বাকী অর্ধেক থেকে আর আধখানা ছায়াপথ। দেখলে বোঝা যাবে গোটা ছায়াপথ যেন একটা চাকতির মত। এই চাকতিই হচ্ছে একটা বিশ্ব। ইংরাজীতে এই বিশ্বের নাম—গ্যালাকসি, বাংলায় ছায়াপথ।

মহাবিশ্বে এমনি প্রায় দশ কোটি ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, অন্তত দশ কোটি বিশ্ব নিয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি। চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতিকে নিয়ে আমাদের যে সূর্য যথা সৌর জগৎ, সেটা যে বিশ্ব বা ছায়াপথের মধ্যে রয়েছে তার নাম 'মিল্‌কিওয়ে,' যাকে বাংলায় বলে 'আকাশ-গঙ্গা'।

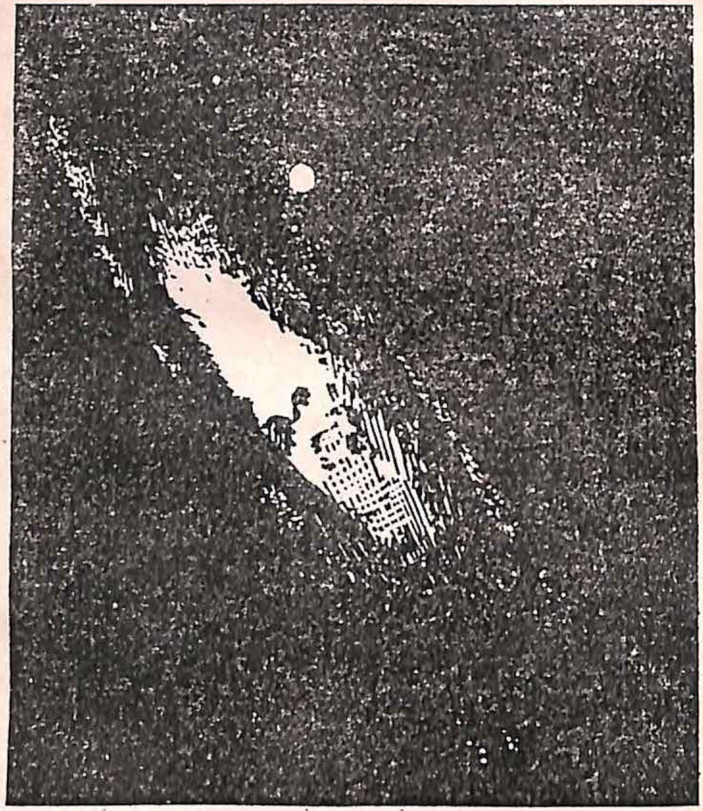
আকাশ-গঙ্গা অনবরত ঘুরছে। আকাশ-গঙ্গার গতির সঙ্গে সূর্য ঘুরছে, সূর্যের ঘোরার সঙ্গে পৃথিবী ঘুরছে, পৃথিবীর ঘোরার সঙ্গে আমরাও ঘুরছি। তাছাড়া ঘুরছি পৃথিবীর নিজস্ব ঘোরা পরিক্রমণ আর পরিভ্রমণের জন্য। বেশ মজার!

ছায়াপথ না হয় জানা গেল। কিন্তু নীহারিকা কি?

নীহারিকা হচ্ছে গ্যাস আর ধুলোর মেঘ। নীহারিকার গ্যাসের

ঘনত্ব পৃথিবীর বাতাসের ঘনত্বের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু তবুও এক একটি নীহারিকা মহাশূন্যে এতই জায়গা জুড়ে আছে যে, ওর ভর সূর্যের ভরের তুলনায় হাজার গুণ বেশী। নীহারিকার কোন নিজস্ব আলো নেই। ওর ভিতরে যে-সব তারা আছে তাদের আলোতেই নীহারিকা আলোকিত, তাই তাকে দেখা যায়।

একটা মতবাদ প্রচলিত আছে—কোটি কোটি তারার মাঝে এমন



নীহারিকা

তারাও আছে, যাদের আজ আলো নেই, তাপও নেই। কিন্তু আলো-তাপ না থাকলে কি হবে, মহাশূন্যের মধ্যে ওরা আগের মতই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সব মরা তারাগুলো অন্ধকার আকাশে ঘুরতে ঘুরতে অনেক সময় নিজেদের মধ্যে ঠোকা-ঠুকি খায়। আর তখনই

ভীষণ আগুন জ্বলে ওঠে। সেই প্রচণ্ড আগুনে ওদের দেহের সব কিছু জ্বলে-পুড়ে তৈরী হয় তপ্ত বাষ্প। ওই তপ্ত বাষ্প হাজার হাজার বছর ধরে মহাশূন্যে শুধু জ্বলতেই থাকে। একেই বিজ্ঞানীরা বলেছেন 'নীহারিকা'। নীহারিকা নামটি যতই মিষ্টি হোক না কেন, আসলে কিন্তু মরা নক্ষত্রদের চিতার আগুন ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু জ্বলছে আর জ্বলছে।

দূরে, বহু দূরে মহাশূন্যের মধ্যে কোটি কোটি মাইল জায়গা জুড়ে নীহারিকা রয়েছে। নীহারিকাদের দেহের বাষ্পরাশি স্থির নেই। শুধু ছুটোছুটি করছে আর ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রচণ্ড বেগে গোলাকার পথে ওরা ঘুরছে আর দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। মহাশূন্যে শুধু আগুন আর ভাঙ্গা-গড়ার খেলা। সূর্যে আগুন, নক্ষত্রে আগুন, উল্কার ঘর্ষণে আগুন। বিরাট যে নীহারিকার রাজত্ব, যার আয়তন হাজার হাজার সূর্যের রাজত্ব থেকেও বড়, সেখানেও আগুন। অথচ ওই নীহারিকার আগুনও একদিন আবার ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধে। আর তখনই সৃষ্টি হয় একটি সূর্য বা নক্ষত্র।

আলো আর তাপ হারিয়ে মরা তারাগুলো অনেক সময় নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি খায়। ফলে তৈরি হয় আগুন আর বাষ্প ; তৈরী হয় নীহারিকা। আবার ওই জ্বলন্ত নীহারিকার বাষ্প আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয় এবং তা থেকেই সৃষ্টি হয় নক্ষত্রের। ওই নক্ষত্রই এক একটি সূর্য। আর এই সূর্যের দেহ থেকেই তৈরী হয়েছে গ্রহ-উপগ্রহ, গ্রহ-কণিকা।

নীহারিকার দেহ থেকেই আমাদের সূর্য এবং সব কয়টি গ্রহ-উপগ্রহ আর গ্রহ-কনিকাদের সৃষ্টি হয়েছে—এই মতবাদকে 'নীহারিকা-বাদ বা বলয় মতবাদ বলে। বিজ্ঞানী লাপ্লাস এই মতবাদের প্রবর্তক।



মহাশূন্যে অভিযান

1957 খৃষ্টাব্দের 4ঠা অক্টোবর মানুষের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল দিন। এই দিন মানুষের হাতে-গড়া প্রথম মহাকাশ-যান যাত্রা শুরু করলো মহাশূন্যের পথে। প্রথম যানটি হলো একটি 'স্পুৎনিক'।

আমাদের বাঙলা ভাষায় আমরা যাকে 'উপগ্রহ' বলি, রাশিয়ানরা তাকেই বলে 'স্পুৎনিক'। পৃথিবীর ইতিহাস থেকে স্পুৎনিক কোন দিন মুছে যাবে না। ওই স্পুৎনিক-ই প্রতি 95 মিনিটে পৃথিবীর চারদিকে একবার ক'রে ঘুরতে পেরেছিল। ওর ওজন ছিল 184 পাউণ্ড, আর গতি ছিল সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল। প্রায় 1400 বার পৃথিবীকে পাক খাওয়ার পর ঠিক তিন মাস বাদে বায়ুর ঘন স্তরে ওটি নেমে এসে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু পুড়লে কি হবে? দ্বিতীয় স্পুৎনিক আকাশে উঠলো 1957 সালে 3রা নভেম্বর। ওর ওজন ছিল অনেক বেশী, 1158 পাউণ্ড। প্রতি 103 মিনিটে একবার হিসেবে মোট 2370 বার পাক খেয়ে প্রায় 4 মাস পর এ-টিও একই ভাবে ধ্বংস হলো। তারপর তৃতীয় স্পুৎনিক মহাশূন্যে পাড়ি দিলো 1958 সালের 15ই মে। ওর ওজন আরো বেশী 1975 পাউণ্ড। পৃথিবীকে 10,037 বার পাক দিয়ে তেইশ মাস পর আগের দু'টির মতই পুড়ে ছাই হলো।

তারপর চাঁদের দিকে তাক ক'রে ছাড়া হলো প্রথম 'লুনিক'। সে

যুগান্তরে প্রকাশিত প্রবন্ধের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত অংশ।

1959 সালের 2রা জানুয়ারী। এটি সূর্যের চারদিকে ঘুরতে লাগলো ; যেন একটি নতুন গ্রহ।

আরো 8 মাস পর দ্বিতীয় লুনিক চাঁদের দেহকে আঘাত করলো 14ই সেপ্টেম্বর ভোর রাতে। চাঁদে পৌঁছুবার আগেই চাঁদের অদেখা অংশের ফটো তুলে নিতে পেরেছিল ওই দ্বিতীয় লুনিক। আর সে-ফটো পৃথিবীর মানুষের কাছেও এসে পৌঁচেছে।

দ্বিতীয় লুনিকের সাফল্যের পর মহাকাশে মানুষ পাঠাবার বহু পরীক্ষা চলছিলো। কিন্তু এই সেদিন গত 12ই এপ্রিল (1961) সারা



প্রথম মহাকাশচারী য়ুরী গাগারিণ

বিশ্বের মানুষ খবরের কাগজের পাতায় শুধু একটা খবর পেয়ে চমকে উঠলো। সে খবর—11ই এপ্রিল মানুষ যাত্রা করেছে মহাশূন্যে।

মানুষ জানলো প্রায় 130 মন ওজনের যে রকেট বিমানটি একজন মানুষকে নিয়ে মহাকাশ পরিক্রমায় যাত্রা করেছে তার নাম 'ভষ্টক', আর মানুষটি—য়ুরী গাগারিন।

109 থেকে 187 মাইলের দূরত্বে থেকে প্রতি 89 মিনিট 1 সেকেণ্ডে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে প্রায় 108 মিনিট পর পৃথিবীর বুকে নেমে এলো গাগারিন। মাটিতে নেমে তার প্রথম কথা হলো—'আমি ভালই আছি, কোনরূপ আঘাত পাইনি'।

য়ুরী গাগারিন। দু'টি শব্দ দিয়ে ছোট্ট একটি বিদেশী নাম। এই নামটি দেশে দেশে আজ ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সবাই চেনে গাগারিনকে। অথচ কিছুদিন আগে কে চিনতো তাকে ?

এই তো সেদিনের কথা। গত এপ্রিল মাসের 1 তারিখে খবরের কাগজ খুলে সবাই অবাক হয়ে গেল। বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো, লেখা রয়েছে—পৃথিবীর একজন মানুষ মহাশূন্যে পাড়ি দিয়েছে। অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করতে লাগলো শূন্যচারী মানুষের মর্তে ফিরে আসার জন্য। অনেকে তো বিশ্বাস করতেই পারলো না এ কথা। ভাবলো একি কখনো হতে পারে ? জীবন্ত মানুষ পাড়ি দেবে স্বর্গে ? যত সব আজগুবি কথা !

কিন্তু পরের দিন খবরের কাগজে আবার যখন বেরুলো স্বর্গ থেকে মানুষ ফিরে এসেছে মর্ত্যে, তখন সবাই বিশ্বাস করলো, স্বর্গে না-হোক, মহাশূন্যে উঠে দেড় ঘণ্টা ধ'রে উড়ে উড়ে মর্ত্যের মানুষ আবার ফিরে এসেছে মর্ত্যে।

নাম-না-জানা একটি যুবক অসীম সাহস বুকে নিয়ে মহাশূন্যে যখন পাড়ি দিয়েছিলো তখন কে আর চিনতো তাকে ? সেকি নিজেও কোনদিন ভেবেছে, পৃথিবীর মানুষের মুখে মুখে তার নাম একদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াবে ?

য়ুরীর ছিল অসীম কর্মদক্ষতা, নিখুঁত ছিল তার কার্যপদ্ধতি। আর বুকে ছিল অফুরন্ত সাহস। তাই মহাশূন্যে পাড়ি দেবার জন্য তাকেই বেছে নেওয়া হলো সবার আগে। দিনের পর দিন কত কৌশলের

ভিতর দিয়ে তাকে মহাশূন্যে উড়বার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। কত কঠিন সে-পরীক্ষা।

শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যই সে পাড়ি দিল মহাশূন্যের অচেনা অজানা পথে। তার সঙ্গে কেউ সেদিন ছিল না। সেও জানতো না মহাশূন্যের কোথায় গিয়ে কোন্ জায়গায় সে পড়বে। হয়তো এটাই তার শেষ যাত্রা পৃথিবীর বুক থেকে। হয়তো জীবন্ত অবস্থায় আর কোনদিন সে ফিরবে না পৃথিবীতে। মহাশূন্যের বুকে কোথায় সে হারিয়ে যাবে, তাও পৃথিবীর মানুষ কেউ কোনদিন জানবে না। কেউ জানবে না কোথায় তার শেষ নিঃশ্বাস পড়বে। অথবা হয়তো শুধু জয়ের মুকুট মাথায় নিয়ে এই পৃথিবীতেই ফিরে আসবে সে।

সে ফিরে এসেছে। জয়ের মুকুটও তার মাথায়। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একমাত্র য়ুরী গাগারিনই আজ বলতে পারে—'পৃথিবী যে গোল, একথা সকলে কানেই শুনেছে, কিন্তু চোখে দেখেছি আমি শুধু একা'।

য়ুরী গাগারিন আজ শুধু সোভিয়েতের বীর নয়, গোটা পৃথিবীর বীর সে।

পৃথিবীর দ্বিতীয় বীর হলো মেজর গেরমান টিটভ। তিনিও সোভিয়েত দেশের মানুষ। 1961 সালের 6ই আগষ্ট, বীর টিটভ 17 বার মহাকাশ পরিক্রমা ক'রে ফিরে এলেন পৃথিবীতে। পৃথিবীর মানুষ কতো অভ্যর্থনা করলো তাঁকে।

আমেরিকার বিজ্ঞানীরাও মহাকাশের যাত্রায় চুপচাপ বসে নেই। কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরী করার ব্যাপারে তাঁদের প্রথম চেষ্টা হয় 1957 সালের 6ই ডিসেম্বর তারিখে। কৃত্রিম উপগ্রহের নাম ছিল এক নম্বর 'ভ্যানগার্ড' আর ওজন ছিল সাড়ে তিন পাউণ্ড। দুঃখের কথা প্রথম চেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু তাতে কি আসে যায়! তাদের দ্বিতীয় চেষ্টা সফল হলো।

1962 সালের 20শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকাবাসী কর্নেল জন গ্লেন তিন বার মহাকাশ পরিক্রমা ক'রে মর্তে ফিরে এলেন। তারপর

কমাণ্ডার ম্যালকম স্কট কার্পেণ্টারও তিন বার পরিক্রমা শেষ করলেন। তিনি মহাকাশ যাত্রা করেছিলেন 1962 সালের 24শে মে।

সোভিয়েতের মানুষ কিন্তু বসে রইলো না। 1962 সালের 11ই আগষ্ট মেজর নিকোলায়েভ 64 বার এবং 12ই আগষ্ট কর্নেল পোপোভিচ 48 বার মহাকাশ পরিক্রমায় সফল হলেন। শুধু তাই-ই নয়, তাঁরা আবার ওই মহাকাশে ব'সে ব'সেই পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করলেন।

তারপর আমেরিকার মেজর গর্ডন কুপার 1963 সালের 6ই মে রওনা হয়ে 22 বার এবং সোভিয়েতের কর্নেল ভালেরী বিকোভস্কি 14ই জুলাই রওনা হয়ে 81 বার মহাকাশ পরিক্রমা করলেন। এমন কি ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা নামে একজন সোভিয়েত নারীও একটি পৃথক মহাকাশ যানে 16ই জুলাই তারিখে রওনা হয়ে 48 বার মহাকাশ পরিক্রমা ক'রে ফিরে এলেন পৃথিবীতে। ভ্যালেন্তিনাই পৃথিবীর প্রথম নারী মহাকাশচারিণী।

আবার মহাকাশে সূর্যোদয় হলো 1964 সালের 12ই অক্টোবর। 'ভস্কোদ' বা 'সূর্যোদয়' নামে সোভিয়েত মহাকাশযান তিন জন যাত্রী নিয়ে মহাকাশ পরিক্রমান্তে ফিরে এলো 13ই অক্টোবর। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম একই যানে যাত্রা করলেন একাধিক মানুষ। তাঁরা হলেন পাইলট কর্নেল ভ্লাডিমির কোমারভ, বিজ্ঞানী কনস্তান্তিন ফিয়োক্তিস্তভ ও ডাক্তার বরিস ইগোরভ। এতো উর্ধ্বে আর কখনো আর কোন যান ওঠেনি।

1965 সালের 18ই মার্চ, মর্তের মানুষের আবার মহাকাশে অভিযান। এবারে মহাকাশে শুধু পরিক্রমা নয়, মহাশূন্যে মানুষের প্রথম পদচারণা। পদচারণা করলেন একজন রাশিয়ান—লেঃ কর্নেল আলেক্সি লিওনভ। মহাকাশযানটি ছিলো দ্বিতীয় 'সূর্যোদয়' অর্থাৎ ভস্কদ-2। আর তার পরিচালক ছিলো কর্নেল পাভেল বেলিয়াফেভ।

ভাবতে অবাক লাগে, ভস্কদের পৃথিবী প্রদক্ষিণের সময় মিঃ লিওনভ ডিগবাজী খেয়ে লাফিয়ে পড়লেন মহাশূন্যে। তারপর

মহাশূন্যে দশ মিনিটকাল ভেসে রইলেন। এই সময় তিনি ক্যামেরা দিয়ে ফটো তুললেন মহাকাশযানের বাইরের অংশের। পৃথিবী ও মহাশূন্য ভালভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে আবার তিনি মহাকাশযানের ভিতর ঢুকলেন।

তিন মাস না পেরোতেই 3রা জুন আবার মানুষের জয়গান। এবারে গাইলেন মারকিন (আমেরিকা) দেশের দু'জন মানুষ—জেমস এ ম্যাকডিভিট এবং মেজর এডওয়ার্ড হোয়াইট।

ঘণ্টায় সাড়ে সতের হাজার মাইল বেগে জেমিনি 4 নামে মহাকাশযানটি পৃথিবীকে চক্কর দিতে লাগলো। বৈজ্ঞানিকদ্বয় চারদিন ভারশূন্য অবস্থায় থেকে অনেক তথ্য নিয়ে ফিরে এলেন পৃথিবীর মাটিতে। চক্কর দিতে দিতে মহাকাশ-যানটি যখন প্রশান্ত মহাসাগরের 150 মাইল উপরে তখন এডওয়ার্ড হোয়াইট হামাগুঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন যান থেকে। তারপর কুড়ি মিনিট ধ'রে মহাকাশে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ালেন। এই সময় তিনি অবশ্য পঁচিশ ফুট দীর্ঘ এক দড়ি দিয়ে যানটির সঙ্গে বাঁধা ছিলেন। একসময় মহাকাশ-যানটির চালক জেমস্ ম্যাকডিভিটের সঙ্গে এডওয়ার্ড কিছু কথাবার্তা বলে নিলেন। আবার প্রবেশ করলেন সেই মহাকাশ-যানে।

চারদিন পর যানটি পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এল।

একুশে আগষ্ট 1965। মহাকাশ অভিযানে রওনা হলেন গর্ডন কুপার এবং চার্লস বনরাড। জেমিনী 5 আমেরিকার ওই দুই মহাকাশচারীকে নিয়ে 120 বার ভূ-প্রদক্ষিণ করলো। সময় লাগলো প্রায় আট দিন। নভচরেরা পৃথিবীতে ফিরে এলেন 29শে আগষ্ট।

ডিসেম্বরের চার তারিখ। ফ্রাঙ্ক বোরম্যান ও জেমস লোভেল যাত্রা করলো জেমিনি 6-এ চেপে। কিন্তু জেমিনি-6 এর খবর কি?

জেমিনি 7-এর আগেই তো জেমিনি-6 এর মহাকাশ পরিক্রমার কথা। কি হল তাহলে?

আসলে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ছ'নম্বর জেমিনির যাত্রা স্থগিত

রাখতে হয়। তার যাত্রা সুরু হয় ডিসেম্বরের পনের তারিখে। জেমিনি 6 এ আরোহী হলেন ওয়ালটার শিরা এবং টমাস স্ট্যাফোর্ড। যে কক্ষ-পথে জেমিনি 7 ভেসে চলেছে সেই পথেই জেমিনি 6 ঘুরতে লাগল। এই প্রথম একই পথে দুটো যান-মহাকাশ পরিক্রমা করল।

16ই ডিসেম্বর জেমিনি 6 এবং 18ই ডিসেম্বর জেমিনি 7 ফিরে এল পৃথিবীর মাটিতে।

আবার যাত্রা সুরু হল 1966 সালের 16ই মার্চ। এবারের নভচর হলেন নীল আরমষ্ট্রং আর তাঁর সহকারী ডেভিড স্কট। মূল মহাকাশ-যান জেমিনি 8-এর রওনা হওয়ার আগেই আরো একটি যান অ্যাজেনাকে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে অ্যাজেনার পাশে এসে দাঁড়াল 8 নম্বর জেমিনি। বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপিত হল দুই যানে। কিন্তু কাজের কাজ তেমন হল না। গোলযোগ দেখা দেওয়ার জন্য জেমিনি 8 ফিরে এল।

জুন মাসের 3 তারিখে টমাস স্ট্যাফোর্ড এবং ইউজেন সারগণ জেমিনি 9-এ চেপে মহাকাশে যাত্রা করলেন। ব্যর্থ হল এ যাত্রা। তাঁরা ফিরে এলেন। তবে তার আগেই নভচর সারনান ঘণ্টা দুয়েক মহাকাশে ভেসে বেড়ালেন।

এর পরের ঘটনা চমকপ্রদ। 18ই জুলাই জন ইয়ং ও মাইকেল কলিন্স-কে নিয়ে জেমিনি 10 মহাকাশে উঠে গেল। পৃথিবী থেকে প্রায় চারশ' ছিয়াত্তর মাইল উর্ধে পরিক্রমণ করতে লাগল। শুধু তাই-ই নয়। মানব—আরোহীহীন যানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হলেন তাঁরা। মহাকাশের কক্ষ-পথে জেমিনি 10 এবং অ্যাজেনা পরস্পরে জোড় বেঁধে চলতে লাগল। কলিনস বেরিয়ে এলেন জেমিনি থেকে। তিনশ মিনিট বিচরণ করলেন মহাকাশে। চারমাস আগে রওনা হওয়া অ্যাজেনার গা থেকে মহাকাশ-ভস্ম সংগ্রহ করলেন তিনি। তারপর 21শে জুলাই জেমিনি 10-কে নিয়ে নিরাপদে অবতরণ করলেন পৃথিবীর বুকে।

1966 সালের 12ই সেপ্টেম্বর জেমিনি 11 রেকর্ড সৃষ্টি করল।

নভচর ছিলেন চার্লস কনরাড এবং রিচার্ড গর্ডন। পৃথিবীর চারপাশে পুরোপুরি একবার পাক খাওয়ার আগেই জেমিনি 11-এর নভচররা অ্যাজেনার সঙ্গে যুক্ত হলেন। 44 বার ভূ-প্রদক্ষিণ করার পর এই যান পৃথিবীতে নেমে এল।

জেমিনি পর্বের সর্বশেষ হল জেমিনি 12-এর যাত্রা। তারিখ 1966 এর 11ই নভেম্বর। নভচর জেমস লোভেল আর এডুইন অলডরিন। অলডরিন পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণের ছবি তুললেন। আরো অনেক ছবি তুলে এবং মহাকাশ সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করে 14 নভেম্বর ফিরে এলেন।

মহাকাশ অভিযানে শুধু কি আমেরিকারই সাফল্য। না, তা নয়। সোভিয়েত দেশ-ও সমান তালে এগিয়ে চলেছে। ভোস্তকের পর তাঁরা ব্যবহার করলেন সোয়ুজ। সোয়ুজের যন্ত্রপাতি যেমন বড় তেমনি তার কলাকৌশল উন্নততর। 1967 সালের 12ই এপ্রিল সোয়ুজ 1-এ চড়ে মহাকাশে পাড়ি দিলেন ভ্লাদিমির কমোরভ। দুর্ভাগ্য তাঁর; দুর্ভাগ্য সোভিয়েত দেশের। আগুন ধ'রে গেল সোয়ুজের। বীর কমোরভ নিহত হলেন।

এই ঘটনার পর সোভিয়েত দেশ কিন্তু মুসড়ে পড়েনি। নতুন উৎসাহে তাঁরা মহাকাশে উৎক্ষেপ করলেন সোয়ুজ 3। সেদিন ছিল 1968 সালের 26শে অক্টোবর। সোয়ুজ 3-তে নভচর ছিলেন সোভিয়েত বীর বেরেগোভয়। ইতিমধ্যে মানবহীন সোয়ুজ 2 মহাকাশে এল। মিলন হল সোয়ুজ 3 এর সঙ্গে।

1969 সালের 14 ও 15ই জানুয়ারী যথাক্রমে সোয়ুজ 4 ও সোয়ুজ 5 পর পর মহাকাশে পাড়ি জমাল। নতুন রেকর্ড করলেন সোভিয়েত দেশ। ওরা আমেরিকার মত অত ঢাক পেটায় না। যা ক'রে চুপি চুপি। আকাশে যখন কোন মহাকাশ-যান পাড়ি দেয় তখুনিই বিশ্বের লোক জানতে পারে। এমনকি তার দেশের লোকও আগে থেকে কিছু খবর পায় না। তাই আমেরিকানরা প্রতিনিয়ত-ই ভাবতে থাকে এবুঝি কোন চন্দ্র-যান চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল।

সোয়ুজ 4 এ নভচর ছিলেন কলোনাল সাটালভ। আর সোয়ুজ 5 এ ছিলেন বোরিস ভলিনভ, আলেকসি ইলিমিয়েভ এবং ইভজেনি খ্রুনভ। খ্রুনভ ও ইলিসিয়েভ আপন সোয়ুজ থেকে বেরিয়ে মহাকাশে অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন। তারপর পূর্ব পরিকল্পনা মত সোয়ুজ 4-এ প্রবেশ করলেন। সেখানে ছিলেন সাটালভ। তাঁর পাশেই বসলেন তাঁরা। মহাকাশের বুকে এক যান থেকে বেরিয়ে আর এক যানে প্রবেশ করার নজীর এই প্রথম। সত্যিই মহাকাশ অভিযানে সোভিয়েত দেশ আমেরিকা থেকে অনেক এগিয়ে।

কিন্তু আমেরিকা হার মানবে কেন? চন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি তার পুরোদমে।

27শে জানুয়ারী, 1967 সাল। কেপ কেনেডিতে প্রস্তুতি চলছে অ্যাপেলো 1-কে মহাকাশে পাঠাবার। 14 দিনের জন্য অ্যাপেলো রওনা হবে 21শে ফেব্রুয়ারী। তিন নভচর গ্রিমস, সোফি ও হোয়াইট যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করছেন অ্যাপেলোর। হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে গেল। তারপর শুধু শব্দ—'হেল্প! আমরা জ্বলে যাচ্ছি।' কোন হেল্প করা গেল না। মুহূর্তেই সব শেষ। তিন জনেই প্রাণ হারালেন। চন্দ্র যাত্রার প্রথম শহীদ হলেন—গ্রিমস, সোফি আর হোয়াইট।

মার্কিন মহাকাশ—বিজ্ঞানীরা সাময়িক ভাবে বিচলিত হলেন। তারপর খুব সতর্কতার সঙ্গে পাঠালেন 1968 সালের 10-ই জানুয়ারী আরো একটি মহাকাশ-যান অ্যাপেলো।

অ্যাপেলো 2 থেকে অ্যাপেলো 6 পর্যন্ত নভচর ছাড়াই মহাকাশে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। বার বার পরীক্ষা করা যাতে পরবর্তী নভচরেরা আর কোন দুর্ঘটনায় না পড়ে।

1968 সালের 11-ই অক্টোবর তিন নভচর—ওয়ালটার শিরা, ডন ইজেল ও ওয়ালটারকানিংহাম—অ্যাপেলো 7 এ চেপে যাত্রা করলেন মহাকাশে। চাঁদের দেশে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার এটাই প্রথম প্রচেষ্টা। প্রচেষ্টা সার্থক হল। এগার দিন মহাকাশে বিচরণ করে নভচরেরা পৃথিবীতে ফিরে এলেন।

তারপর অ্যাপেলো 8, তারিখ 21শে ডিসেম্বর 1968 সাল। ফ্রাঙ্ক বোরম্যান, হেমন লোভেল ও উইলিয়াম অ্যানডারস—এই তিন মার্কিন নভচর চাঁদের দেশে প্রথম পাড়ি দিলেন। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্ত হলেন তাঁরা। অ্যাপেলোর তখন গতি ছিল ঘণ্টায় প্রায় 25000 মাইল। এটা মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ার বেগ। চাঁদের আকাশে প্রবেশ করলো অ্যাপেলো। তার ভিতরে রয়েছেন তিন নভচর। 60·5 থেকে 169 মাইল দূরত্বে রেখে চাঁদকে দশবার পাক দিয়ে পৃথিবীর পথে পাড়ি দিলেন তিন নভচর। এঁরাই প্রথম মানুষ যাঁরা পৃথিবীর আকর্ষণ ছিন্ন করে চাঁদের দেশে গেলেন। আবার চাঁদের আকর্ষণ ছিন্ন করে পৃথিবীতে ফিরে এলেন। চাঁদ আর তাঁদের কাছে দূরে নয়।

মহাকাশে চন্দ্র-যানের পরীক্ষার জন্য অ্যাপেলো 9 যাত্রা শুরু করলো 1969 সালের 28শে ফেব্রুয়ারী। নভচর ছিলেন জেমস ম্যাকডিভিট, ডেভিড স্কট এবং রাসেল সোয়েকারট। মহাকাশে দশ দিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁরা ফিরে এলেন পৃথিবীর বুকে।

পরের অধ্যায় অ্যাপেলো 10-এর। 18ই মে 1969 সাল। তিন নভচর—টমাস্ স্ট্যাফোর্ড, ইউজিন সারনাম আর জন ইয়ং। এঁরাও পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে চাঁদের দেশে পৌঁছুলেন। চাঁদকে মাত্র দশ মাইল দূরত্বে রেখে আড়াই দিন ধরে 31 বার প্রদক্ষিণ করলেন তাকে। কতো তার ছবি তুললেন।

চাঁদ পর্যবেক্ষণ শেষ হল। এবার পৃথিবীতে ফেরার পালা। চাঁদের আকর্ষণ ছেদ করে নির্ভুল পথেই পৃথিবীর আকর্ষণের এলাকায় প্রবেশ করলো তিন নভচর। তাঁরা এখন বলতে পারেন দশ মাইল দূর থেকে চাঁদকে আমরা দেখেছি। চন্দ্রে মানুষের অবতরণে আর কোন বাধা নাই।



সোমবার, 21শে জুলাই, 1969 সাল। ভারতীয় সময় সকাল 8 ঘণ্টা 26 মিনিট 20 সেকেণ্ড।

মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মুহূর্ত, গৌরবতম দিন।

এই দিন চাঁদের পিঠে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ। অনন্তকালের স্বপ্ন সফল হল আজ। সমাপ্তি হল দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টার। চন্দ্রে অবতরণের সাধনায় মানুষ সিদ্ধি লাভ করল।

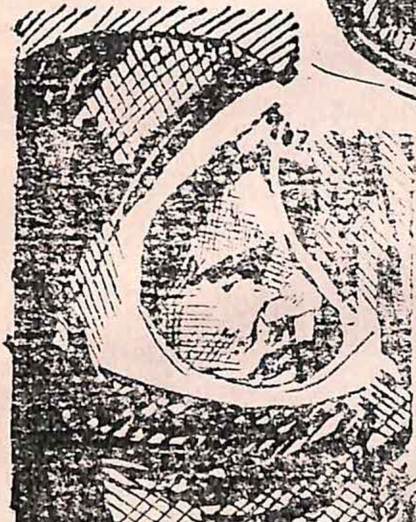
চন্দ্রে প্রথম পদার্পণ করলেন নীল্ আরমস্ট্রং। অ্যাপেলো 11 এর অধিনায়ক তিনি। চাঁদের বুকে পা দিয়েই আরমস্ট্রং বললেন—একজন মানুষের পক্ষে এটা একটা ছোট্টপদচালনা আর সমগ্র মানব-জাতির পক্ষে বিরাট এক পদক্ষেপ। চাঁদের ধূসর মাটিতে পা দিতেই তাঁর দুই পা এক কি দু' ইঞ্চি বসে যাবার উপক্রম হল। তারপর তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন আরমস্ট্রং।

বালুকাময় নুড়িতে আকীর্ণ চাঁদের পিঠ। প্রথমেই যে নুড়িটি সামনে পেলেন সেটি কুড়িয়ে পকেটে পুরলেন তিনি।

কেমন যেন ছায়া ছায়া অন্ধকার। কোথায় পা ফেলছেন আরমস্ট্রং ভালভাবে বুঝতেই পারছেন না। ক্যাঙ্গারুর মত লাফিয়ে



নীল আরমস্ট্রং



এডুইন অলডরিন



মাইকেল কলিনস্

লাফিয়ে চললেন বিশ মিনিট। বিশ মিনিট পরে আরমস্ট্রং-এর সহচর এডুইন অলড্রিন চাঁদের ভেলা ঈগল থেকে নেমে এলেন। তাঁর এই নেমে আসার ছবি তুললেন আরমস্ট্রং। তাঁদের সময় কম। অথচ কাজ অনেক। তাই চন্দ্র-বিজয়ের স্মারক-ফলকটি আরমস্ট্রং পড়লেন—পৃথিবীর মানুষ বেতারে তা শুনতে পেল :

1969 সালের জুলাই মাসে পৃথিবী—গ্রহ থেকে মানুষ এসে এখানে প্রথম পদক্ষেপ করল। আমরা এখানে এলাম সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ কামনায়।

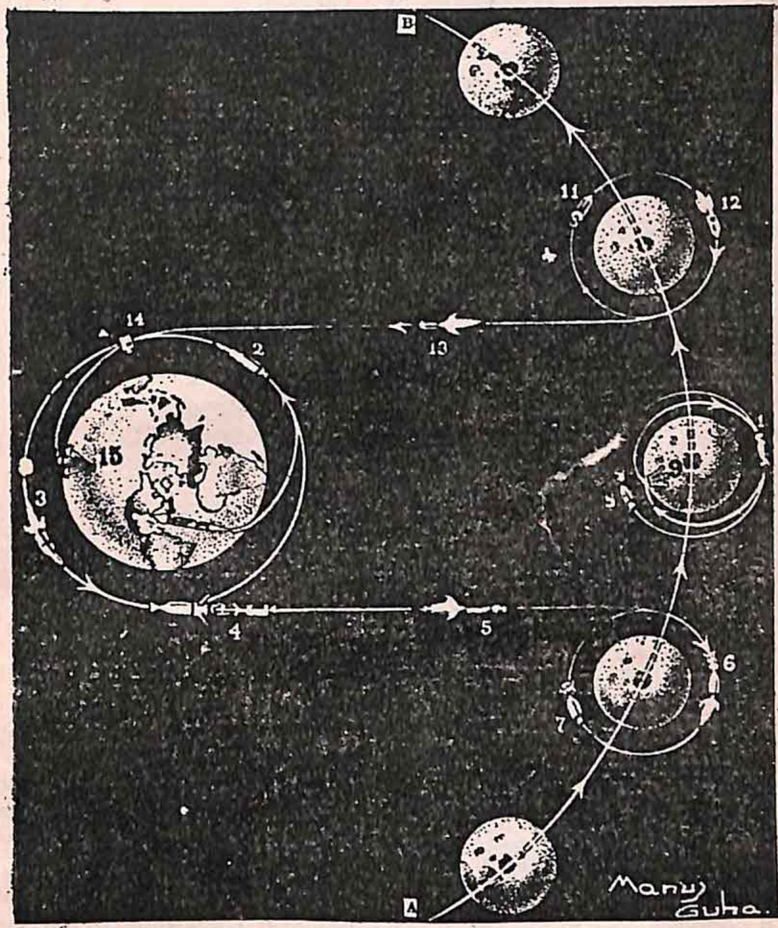
তারপর তাঁরা দুজনে মিলে চাঁদের বুকে মার্কিন পতাকা পুঁতে দিলেন।

দুজনে আরো কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন। কুড়িয়ে নিলেন নানা জাতের আর নানা ধরণের নুড়ি। বিজ্ঞানের দিক থেকে এগুলো অমূল্য সম্পদ। তিন ইঞ্চি গভীর এক জায়গা থেকে কিছুটা মাটি তুলে নিলেন। আরমস্ট্রং-এর মনে হল—এ মাটি যেন ভিজে ভিজে। তবে কি জল আছে এখানে? এবং সম্ভবত জীবন ও? বিজ্ঞানীদের আশা—নুড়ি আর মাটি দিয়ে পরীক্ষা করবেন—শুধু চাঁদের রহস্যই না; সমগ্র সৌরজগতের সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করবেন।

পৃথিবী থেকে বেতার নির্দেশ গেল ওঁদের চাঁদের ভেলায় ফিরে যাওয়ার জন্য। প্রথমে অল্ডরিন পরে আরমস্ট্রং ঈগলে প্রবেশ করলেন। ভারতীয় সময় তখন সকাল 11টা বেজে 21 মিনিট। অল্ডরিন এক ঘণ্টা চুয়ান্ন মিনিট এবং আরমস্ট্রং দু'ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিট ধরে চাঁদের বুকে হেঁটে ছিলেন।

ভেলায় তাঁরা ঢুকলেই তার ঢাকনা বন্ধ হয়ে গেল। ভিতরে বসে দুজনে আহার করলেন। আহার শেষে নিদ্রা। নিদ্রা শেষে পৃথিবীতে ফেরার পালা। চাঁদে বেড়ান এবারের মত শেষ।

ভারতীয় সময় রাত্রি 11টা 24 মিনিটে আমেরিকার দুই মহাপুরুষ চাঁদের ভেলা ঈগল-এর রকেট ইন্‌জিন চালু করলেন। এই ঈগলের পা চাঁদের মাটি স্পর্শ করেছিল ভারতীয় সময় জুলাই কুড়ি, সোমবার



1. অ্যাপেলোর যাত্রা শুরু পৃথিবী থেকে
2. 3. পৃথিবীকে পাক দিচ্ছে অ্যাপেলোর
4, 5. পৃথিবীর আকাশ ছাড়িয়ে চাঁদের দিকে
6, 7, 8. চাঁদের আকাশে অ্যাপোলো পাক দিচ্ছে
9. ঈগল নেমে গেল চাঁদের বুকে
10, 11, 12. চাঁদের আকাশে পাক দিচ্ছে অ্যাপেলো
13. চাঁদের আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে
14. পৃথিবীর আকাশে অ্যাপেলো
15. পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এল নভচরো

রাত একটা বেজে উনপঞ্চাশ মিনিটে। নেমেছিল চাঁদের তন্দ্রা সাগরে।

চাঁদ থেকে 70 মাইল দূরত্বে চাঁদের চারপাশে পাক খাচ্ছিলো এই চন্দ্রাভিযানের মূল মহাকাশযান 'কলম্বিয়া'। কলম্বিয়াতে বসে ছিলেন এই অভিযানের তৃতীয় নভচর মাইকেল কলিনস চন্দ্র-অভিযানের ভূমিকায় তাঁর অবদানও বিন্দুমাত্র কম নয় আরমস্ট্রং আর অল্ডরিন থেকে।

ঈগল ধীরে ধীরে কলম্বিয়ার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তাদের মিলন হল চাঁদের আকাশে। ভারতীয় সময় তখন রাত তিনটে বেজে পাঁচ মিনিট। নভচর দুজন প্রবেশ করলেন মূল মহাকাশযানে। চাঁদের ভেলা পরিত্যক্ত হল চাঁদের আকাশেই।

মহাকাশযানের মূল ইন্‌জিন চালু করা হল। মহাকাশযান বা অ্যাপেলোর গতিবেগ ঘণ্টায় 3478 মাইল (5600 কিলোমিটার) থেকে বেড়ে 5652 মাইলে (9100 কিলোমিটার) উঠলো। এই বেগেই চাঁদের আকর্ষণ ছেড়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অ্যাপেলো 11 তিনজন নভচরকে নিয়ে পৃথিবীর পথে যাত্রা করল।

ঘরের কথা ভাবতে ভাবতে তিনজনেই কখন ঘুমিয়ে পড়লেন। কী গভীর ঘুম, কী নিশ্চিন্তের ঘুম।

পরের দিন 22শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত 11টা 23 মিনিটে অ্যাপেলো 11 সেই কাল্পনিক জায়গাটি পেরিয়ে এল যেখানে চাঁদের অভিকর্ষ আর পৃথিবীর অভিকর্ষ সমান সমান। অ্যাপেলো এখন পৃথিবীর আকর্ষণের ভিতর। তাই তার গতি বেগ দ্রুত বেড়ে গেল। দুর্বার গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে চলেছে অ্যাপেলো। তার নামবার পথে মহাকাশযানের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো একে একে খুলে ফেলা হল। বিরাট মহাকাশযানটি সবশেষে পরিণত হল ছোট্ট একটি ক্যাপস্যুলে। ক্যাপস্যুলটি দেখতে একটি শঙ্কুর মত, ওর তলার দিকের ব্যাস মাত্র 13 ফুট আর উচ্চতা মাত্র 11 ফুট।

চন্দ্র অভিযানের শেষ পর্বে ছ'টন ওজনের ছোট্ট ক্যাপস্যুলটি

তিনজন চন্দ্রচারীকে পেটে পুরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভারতীয় সময় তখন 24শে জুলাই রাত 10টা 19 মিনিট। এর আট দিন আগে অ্যাপেলো 11 চন্দ্র-অভিযানে যাত্রা করেছিল। সেদিন ছিল 16 জুলাই, 1969 সাল বুধবার, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা 7টা 2 মিনিট। আর সেদিনই ভারতে রথযাত্রার উৎসব। মহাপ্রভু জগন্নাথদেব রথে চড়ে রওনা হলেন মাসির বাড়ী। সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রা। আটদিন প্রবাসে থেকে ফিরে এলেন স্বস্থানে। তাই ঘরে ঘরে সেদিনও উৎসবের সমারোহ।

ঠিক একই দিনে চাঁদ মামার বাড়ী পাড়ি দিলেন মহাকাশচারী আরমস্ট্রং। সঙ্গে তাঁর সহযোগী অলডরিন ও কলিনস। আটদিন চন্দ্র বিজয় করে তাঁরাও ফিরে এলেন স্বগৃহে। তাই সারাবিশ্বে আজ আনন্দের সাড়া।

কী বিচিত্র যোগাযোগ।

কী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

বিধাতার কী অমোঘ ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে কে জানে।